সরল

প্রাকৃত ভূগোল

(৭ খানি মানচিত্র ও ৩৯ খানি চিত্র সম্বলিত)

কটক রেভেন্‌সা কলেজের ভূতপূর্ব্ব বিজ্ঞানাধ্যাপক,
কলিকাতা মাদ্রাসার পদার্থ-বিজ্ঞানাধ্যাপক
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, এম্‌, এ,
প্রণীত।

কলিকাতা।
দাসগুপ্ত এণ্ড কোং দ্বারা
প্রকাশিত।

১২৯৫

All rights reserved.

ভূমিকা।

বিগত বৎসর ঢাকা বিভাগের মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচনসময়ে তত্রত্য ইন্‌স্পেক্টর মহোদয় মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, বাঙ্গালাভাষায় বালকগণের পাঠোপযোগী প্রাকৃত ভূগোল নাই। ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের প্রাকৃতিক ব্যাপার অবলম্বন করিয়া পুস্তক প্রকাশিত হয়, ইহা তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। এই মন্তব্য পাঠ করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রণয়ন করিতে অভিলাষ জন্মে। বাস্তবিক, বঙ্গভাষায় এতদ্বিষয়ক যে কয়েকখানি পুস্তক দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে কোনখানি ভাষার কাঠিন্য ও বিষয়ের প্রাচুর্য্যবশতঃ বালকগণের নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য; কোনখানিতে বা সাধারণ ভূগোলের বিষয়ীভূত পর্ব্বত, নদী ও মরুভূমি প্রভৃতির দৈর্ঘ্য প্রস্থ ইত্যাদি সবিস্তর বর্ণিত হইয়া প্রাকৃতিক তত্ত্বের আলোচনা উপেক্ষিত হইয়াছে।

প্রাকৃত ভূগোলকে পৃথিবীর ইতিহাস বলা যাইতে পারে। যাহা কিছু লইয়া পৃথিবী, তৎসমুদয়ই এই বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত। যেমন পদার্থ-বিজ্ঞান পরীক্ষা-সাপেক্ষ, প্রাকৃত ভূগোল তেমনই পর্য্যবেক্ষণ-সাপেক্ষ। যাবতীয় প্রাকৃতিক ব্যাপার সংঘটনের নিয়মাবলী ও তন্নিষ্ঠ কার্য্যকারণপরম্পরা আলোচনা করা এই বিজ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য। এই বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে হইলে পদার্থ-বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় বিজ্ঞানের সাহায্য লইতে হয়। কিন্তু এতগুলি বিজ্ঞান অবগত হওয়া দূরে থাকুক, উল্লিখিত বিজ্ঞানসমূহের অন্তর্গত সামান্য সামান্য মূলতত্ত্বগুলি পরিজ্ঞাত হওয়াও সুকুমারমতি

বালকগণের সাধ্যায়ত্ত নহে। অথচ প্রবল ঝটিকায় নাবিক, আবাসে কৃষক, বাণিজ্যে ব্যবসায়ী প্রভৃতি সকলেরই বাতাসের প্রকৃতি, বায়ুর উষ্ণতা, বৃষ্টির সংস্থান ইত্যাদি বিষয়গুলির কথঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনা ও নদ নদী পর্ব্বত সমুদ্র মনুষ্য প্রভৃতি বর্ণনা করা এ পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে; অপিচ উদ্দেশ্য থাকিলেও উহা সুকুমারমতি বালকগণের স্মৃতিশক্তির বিকাশ ব্যতীত চিন্তা ও বিচার-শক্তির উন্মেষ পক্ষে অনুকূল নহে। মানবজীবনের ন্যায় পৃথিবীরও যে ইতিহাস আছে, সংক্ষেপে তাহা প্রদর্শন করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। এজন্য যাবতীয় বিষয়ের পরস্পর সম্বন্ধ দেখাইতে চেষ্টা করা গিয়াছে।

ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে থাকিয়া যে সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ ও পর্য্যালোচনা করিতে পারা যায়, তৎসমুদয় অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতরূপে বিবৃত হইয়াছে। বঙ্গদেশে বায়ু-মণ্ডলের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করা যেমন অনায়াস-সাধ্য, ভূ-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়গুলি শিক্ষা করা তেমনই কঠিন, এমন কি, এক প্রকার অসম্ভব। এই নিমিত্ত বায়ু-বিজ্ঞানের অন্তর্গত বায়ুর উষ্ণতা, ঝড় ও বৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়গুলি ইহাতে সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে।

প্রস্তাবিত বিষয়সমূহের সম্যক্ বোধ জন্মাইবার নিমিত্ত ৬।৭ খানি মানচিত্র ও ৩০।৪০ খানি বড় বড় প্রতিকৃতি স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত করা গেল। এদেশে এরূপ চিত্রাবলী প্রস্তুত করান কঠিন ও বিলক্ষণ ব্যয়সাধ্য। আশা করি, ঐ সমস্ত চিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে বিশেষ-রূপে হৃদয়ঙ্গম করাইতে যত্নশীল হইবেন।

এই পুস্তকের যাবতীয় বিষয় নানাবিধ দেশীয় ও বিদেশীয় সাময়িক পত্রিকা ও কার্য্যবিবরণ প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় ভূ-বিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ কিং, এসিয়াটিক মিউজিয়মের অধ্যক্ষ উড্‌মেসন ও বঙ্গদেশীয় বায়ুবিদ্যাবিভাগের রিপোর্টার পেডলার সাহেব এই পুস্তক প্রণয়নে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদিগের নিকট চিরবাধিত রহিলাম। পরিশেষে কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, আমার পরম সুহৃৎ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় পুস্তকের আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়া ভাষাবিশুদ্ধি বিষয়ে বহুল পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন এবং ঢাকা কলেজের ইংরাজী সাহিত্যাধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মৈত্রমহাশয় বিষয় নির্ব্বাচন সম্বন্ধে সমুচিত পরামর্শ দিয়াছেন। এক্ষণে ছাত্রগণ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া প্রাকৃতিক ঘটনার কার্য্যকারণ ও পরস্পর সম্বন্ধ আলোচনা করিতে অভিলাষী হইলেই আমার সমুদয় শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি

কলিকাতা মাদ্রাসা
জ্যৈষ্ঠ—১২৯৫।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

সূচীপত্র।

পৃষ্ঠা।

উপক্রমণিকা। ১

প্রথম অধ্যায়।

ভারতের প্রাকৃতিক বিবরণ।

হিমালয় পার্ব্বত্য প্রদেশ ৪
সুলেমান পার্ব্বত্য প্রদেশ ৬
সিন্ধু ও গঙ্গার সমভূমি এবং থুর মরুভূমি ৭
আসাম ও কাছাড় উপত্যকা ৯
বিন্ধ্য ও সাতপুর পার্ব্বত্য প্রদেশ ১০
মালব ও বুন্দেলখণ্ড অধিত্যকা ১০
দাক্ষিণাত্য অধিত্যকা ১১
সিংহল ও বঙ্গসাগরের দ্বীপ ১২

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বায়ুমণ্ডল।

১ § বায়ুর উপাদান, উষ্ণতা ও চাপ।

বায়ুমণ্ডল ১৩
বায়ুর উপাদান ১৩
বায়ুর উষ্ণতা ১৫
বায়ু কিপ্রকারে উত্তপ্ত হয় ১৬
বায়ুর উষ্ণতার প্রতিঘণ্টায় পরিবর্ত্তনের কারণ ১৮
দিবসের গড় উষ্ণতা ১৯
বায়ুর গুরুত্ব ২০

বায়ুর চাপ ২০
বায়ু-চাপের হ্রাসবৃদ্ধির কারণ ২২
সংক্ষিপ্তসার ২৪

২ § বায়ুর জলীয় বাষ্প।

জলীয় বাষ্প ২৪
বায়ুর সিক্ততার ঘণ্টায় ঘণ্টায় হ্রাসবৃদ্ধি ২৭
শিশির ২৭
কোন্ কোন্ অবস্থায় শিশির বেশী সঞ্চিত হয় ২৮
কুজ্ঝটিকা ২৯
মেঘ ও বৃষ্টি ৩০
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩০
কোন্ কোন্ স্থানে বৃষ্টিপাত বেশী হয় ৩১
বর্ষাকাল ৩৩
নির্বর্ষ দেশ ৩৪
শিলাবৃষ্টি ৩৪
তুষার ও নীহার ৩৪
সংক্ষিপ্তসার ৩৫

৩ § বাতাস।

বাতাস ৩৬
বাতাসের নাম ৩৭
সমুদ্র-বাতাস ও ভূ-বাতাস ৩৭
ভারতের মৌসুমী বাতাস ৩৮
নিয়ত বাতাস ৩৯
ঝটিকা ৪০
ধূলি-ঝড় ৪০
পশ্চিমে ঝড় ৪০

ঘূর্ণিঝড় ৪১
জলস্তম্ভ ৪২
বাতাবর্ত্ত ৪৩
বাতাবর্ত্তের গতি ৪৩
বাতাবর্ত্তের পথ ৪৫
বাতাবর্ত্তের কাল ৪৫
বাতাবর্ত্তের সংস্থান ৪৫
বাতাবর্ত্তের অনুসঙ্গী ৪৬
বাতাবর্ত্তের পূর্ব্বলক্ষণ ৫৬
বাতাসের কার্য্য ৪৭
সংক্ষিপ্তসার ৪৮

৪ § জলবায়ু।

জলবায়ু ৪৯
নিরক্ষবৃত্ত হইতে দূরত্বানুসারে উষ্ণতা বিচার ৪৯
সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে উচ্চতানুসারে উষ্ণতা বিচার ৫০
চিরতুষার-রেখা ৫১
সমুদ্র হইতে দূরত্বানুসারে উষ্ণতা বিচার ৫১
বিভিন্ন স্থানের বায়ুর সিক্ততা বিচার ৫২
সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে উচ্চতানুসারে আর্দ্রতা বিচার ৫২
সমভূমির বিভিন্ন স্থানের আর্দ্রতা বিচার ৫৩
সংক্ষিপ্তসার ৫৩

৫ § বৃষ্টি, নদী, তুষার, প্রস্রবণ প্রভৃতির ভূ-পৃষ্ঠের উপর কার্য্য।

বৃষ্টিদ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয় ৫৪
বায়ুদ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয় ৫৬
নদীদ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয় ৫৭

তুষারদ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয় ৬০
বাতাসদ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয় ৬০
জীবদ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয় ৬১
নদীদ্বারা ভূ-ভাগ নির্ম্মাণ ৬১
ভূ-পৃষ্ঠের উপর প্রস্রবণের কার্য্য ৬৬
সংক্ষিপ্তসার ৬৯

তৃতীয় অধ্যায়।

সমুদ্র।

১ § সমুদ্রের প্রাকৃত অবস্থা।

সমুদ্রজলের লবণাদি উপকরণ ৭১
সমুদ্রজলের আলোক ৭৩
সমুদ্রের গভীরতা ৭৩
সংক্ষিপ্তসার ৭৪

২ § ভূ-পৃষ্ঠের উপর সমুদ্রের কার্য্য।

সমুদ্রদ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয় ৭৪
সমুদ্রজলের স্রোত ৭৭
সমুদ্রজলের জোয়ারভাটা ৭৯
বান ডাকা ৭৯
সংক্ষিপ্তসার ৮১

চতুর্থ অধ্যায়।

পৃথিবীর আভ্যন্তরিক ব্যাপার।

১ § ভূ-গর্ভের উষ্ণতা।

পৃথিবীর আদিম অবস্থা ৮২
খনি ও কূপ হইতে ভূগর্ভের উষ্ণতার প্রমাণ ৮৩
সংক্ষিপ্তসার ৮৫

২ § উষ্ণ প্রস্রবণ।

উষ্ণ প্রস্রবণ ৮৬
সংক্ষিপ্তসার ৮৭

৩ § আগ্নেয় পর্ব্বত।

আগ্নেয়গিরি ৮৭
আগ্নেয়গিরির উৎক্ষেপ ৮৮
কর্দ্দম-গিরি ৯২
আগ্নেয়গিরির সংস্থান ও উৎক্ষেপের কারণ ৯৩
সংক্ষিপ্তসার ৯৪

৪ § ভূমিকম্প ও ভূ-পঞ্জরের উদ্গমন ও অধোগমন।

ভূমিকম্পের উৎপত্তি ও প্রকৃতি ৯৪
ভূমিকম্প দ্বারা ভূ-পঞ্জরের পরিবর্ত্তন ৯৭
ভূ-পঞ্জরের অধোগমন ৯৮
ভূ-পঞ্জরের উদ্গমন ১০১
সংক্ষিপ্তসার ১০৪

পঞ্চম অধ্যায়।

ভূ-পঞ্জর।

প্রস্তর ১০৫
মৃত্তিকা ১০৫
স্তরীভূত প্রস্তর ১০৬
জীবাবশেষ ১০৭
প্রস্তরের কাল নির্ণয় ১০৮
জীবজ প্রস্তর ১১২
পাথরিয়া কয়লা ১১২
প্রাণিজ প্রস্তর ১১৪

অগ্নিজ প্রস্তর ১১৯
সংক্ষিপ্তসার ১২০

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পৃথিবীর গতি ও ঐ গতির ফল।

১ § পৃথিবীর আকৃতি ও পরিমাণ।

পৃথিবী গোলাকার ১২১
পৃথিবীর পরিমাণ ১২৩

২ § পৃথিবীর গতি ও ঐ গতির ফল।

পৃথিবীর আবর্ত্তন ১২৪
পৃথিবীর পরিভ্রমণ ১২৫
শীত ও গ্রীষ্ম ১২৮

৩ § সূর্য্য ও পৃথিবীর সম্বন্ধ।

সূর্য্যের আকৃতি, পরিমাণ ও দূরত্ব ১২৯
সূর্য্যের উপাদান ১৩০
পৃথিবী ও সূর্য্যের আকর্ষণ ১৩০
সংক্ষিপ্তসার ১৩২

পরিশিষ্ট।

দিঙ্‌নিরূপণ ১৩৩
ভারতের কয়েকটি স্থানের গড় উষ্ণতার তালিকা ১৩৭
ভারতের কয়েকটি স্থানের গড় বৃষ্টিপাতের তালিকা ১৩৮
ভারতের কয়েকটি স্থানের গড় আর্দ্রতার তালিকা ১৩৯

প্রাকৃত ভূগোল

উপক্রমণিকা।

আমরা পৃথিবীর উপরে প্রতিনিয়ত অসংখ্য অসংখ্য নৈসর্গিক ব্যাপার দেখিতেছি। কিন্তু ঐ সমস্ত ব্যাপারের উৎপত্তি কিরূপে হয় এবং পরিণাম কিরূপ, তদ্‌বিষয় প্রায়ই ভাবি না। আমাদের অধিষ্ঠান-ভূমি ভারতবর্ষেই কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য প্রাকৃতিক ব্যাপার ঘটিতেছে, তাহারই ইয়ত্তা করা যায় না। ভারত-ভূমির শীর্ষদেশে হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গ চিরকাল তুষারাবৃত থাকিয়া প্রকৃতরূপে হিমের আলয় হইয়া রহিয়াছে, আর ভারতের অভ্যন্তরভাগ বঙ্গদেশে আদৌ তুষারই দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতের উত্তরপশ্চিম প্রান্তে বৃষ্টির অল্পতাবশতঃ কত বিস্তীর্ণ স্থান মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে, আর উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তে আসাম ও শ্রীহট্টের উচ্চ প্রদেশ অতিবৃষ্টিপ্রযুক্ত জলা ও আর্দ্র ভূমি হইয়া অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে। শীতকালে উত্তর দিক্ এবং গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ দিক্ হইতে বাতাস বহিয়া থাকে। কিন্তু এই উভয়বিধ বায়ুর অবস্থা এক প্রকার নহে। শীতকালের বায়ু শীতল ও শুষ্ক, গ্রীষ্মকালের বায়ু উষ্ণ ও বৃষ্টিপ্রদ। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, মহানদী প্রভৃতি কত কত নদ নদী অবিশ্রান্ত প্রভূত জল ও পলি বহন করিয়া সমুদ্রে ফেলিতেছে। এত জলই বা কোথা হইতে আসিতেছে এবং ঐ জল ও পলি ভূ-পৃষ্ঠের কিরূপ

পরিবর্ত্তন করিতেছে, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না। আর এক দিকে দেখ, ঝড়, বৃষ্টি ও ঘূর্ণিঝড়ে কত ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত করিতেছে, বড় বড় বাত্যাবর্ত্তে শত শত গ্রাম, নগর, জাহাজ, প্রাণী বিনষ্ট হইতেছে। উহাদের কিরূপ উৎপত্তি, কিরূপ প্রকৃতি, তাহা কি জানিবার বিষয় নহে? মধ্যে মধ্যে আমাদের আবাসভূমি পৃথিবীর কম্পনে কি ভয়ানক অনিষ্ট ও কি ভয়ানক ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। স্থানে স্থানে গ্রাম, নগর, বন ভূগর্ভে প্রোথিত এবং স্থানে স্থানে নব নব ভূভাগ উন্নমিত হইতেছে। কোন কোন স্থানে ভূগর্ভ হইতে রাশি রাশি অগ্নিবৎ গলিত প্রস্তর সতেজে বহির্গত হইতেছে, আর কোন কোন স্থানে প্রকৃতির ঐ ভীষণ ব্যাপার অণুমাত্রও দৃষ্টিগোচর হয় না। খাসিয়া পাহাড়ের ন্যায় উচ্চ পাহাড়ের উপর সমুদ্রজ শম্বুক প্রভৃতি প্রাণীর কঙ্কাল কিরূপে আসিল, কিরূপেই বা রাণীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে রাশীকৃত পাথুরিয়া কয়লা সঞ্চিত হইয়াছে, পাথুরিয়া কয়লাই বা কি? আমাদের আবাসভূমি পৃথিবীর আকার কিরূপ, কিরূপেই বা শূন্যে নিরলম্বভাবে অবস্থিত, কি রূপেই বা দিবা রাত্রি, শীত গ্রীষ্ম ঋতু একটির পর আর একটি চলিয়া আসিতেছে। পৃথিবীকে আমরা এখন যে ভাবে দেখিতেছি, উহা কি ঐ রূপেই প্রথমে সৃষ্ট হইয়াছিল, মনুষ্যাদি জীব জন্তুর আবাস-ভূমি কি চিরকালই ছিল, চিরকালই কি অশ্বত্থ, বট, গোলাপ প্রভৃতি তরুসকল বিরাজ করিতেছে। এইরূপ কত অসংখ্য অসংখ্য ব্যাপার ঘটিতেছে, কত অসংখ্য অসংখ্য ব্যাপার জানিবার আছে। যে শাস্ত্রে এইরূপ প্রাকৃতিক ব্যাপারসমূহের কার্য্যকারণের আলোচনা করা যায়, তাহার নাম প্রাকৃত ভূগোল।

উপরের কয়েকটি পংক্তি হইতে প্রস্তাবিত বিষয়ের আবশ্যকতা ও বিশালতা উপলব্ধি হইবে। পৃথিবী কত প্রকাণ্ড ও বিস্তৃত;

উহার নানা স্থানে নানাপ্রকার ব্যাপার ঘটিতেছে, তাহা আলোচনা করা সহজ নহে। এক ভারতই পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহার প্রাকৃতিক অবস্থা আলোচনা করা সাধ্যায়ত্ত নহে। কেবল পুস্তক পাঠ করিয়া যাবতীয় প্রাকৃতিক ব্যাপারের প্রকৃতি ও কারণ অবগত হওয়া সম্ভবপর নহে। কত অসংখ্য অসংখ্য ব্যাপার জানিবার ও শিখিবার আছে এবং কিরূপে ঐ সকল বিষয় শিক্ষা করা যাইতে পারে, তাহা মোটামুটি দেখাইয়া দেওয়া এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।

প্রথম অধ্যায়।

ভারতের প্রাকৃতিক বিবরণ[১]।

১। ভারতের প্রাকৃতিক ঘটনার বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে উহার প্রাকৃতিক বিবরণ কিঞ্চিৎ জানিয়া রাখা নিতান্ত আবশ্যক। এজন্য এখানে উক্ত বিষয় কিঞ্চিৎ বলা, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ভারতের প্রধান নদী এবং পর্ব্বতসকলের দিক্ দেখাইবার জন্য পুস্তকের প্রথমে ভারতের একটি মানচিত্র দেওয়া গেল।

২। **হিমালয়-পার্ব্বত্যপ্রদেশ।** হিমালয় ও সুলেমান পর্ব্বত ভারতের উত্তর ও উত্তরপশ্চিম প্রান্তের দুর্ভেদ্য ও উন্নত সীমা-স্বরূপ রহিয়াছে। হিমালয়ের পশ্চিমোত্তর ভাগে কৈলাসশিখর (২২,০০০ ফুট)। উহার পাদদেশের নিকট হইতে একদিকে সিন্ধু ও অপর দিকে ব্রহ্মপুত্রনদ উৎপন্ন হইয়া হিমালয়ের উত্তর প্রদেশের জলরাশি ভারতের দুই পার্শ্বের দুই সাগরে (আরব ও বঙ্গ) আনয়ন করিতেছে। শতদ্রু নামক আর একটি নদীও কৈলাসপর্ব্বতের দক্ষিণ মানস-সরোবর ও রাক্ষসতাল-হ্রদ হইতে বহির্গত হইয়া মিথানকোটের নিকট সিন্ধুনদের সহিত মিলিত হইয়াছে। ভারতের পশ্চিমপ্রান্তসীমায় কাবুলনদী ব্যতীত অপর কোন বড় নদী নাই। উহাও আটকের নিকট সিন্ধুতে গিয়া মিশিয়াছে। বস্তুতঃ, হিমালয়ের পশ্চিমসীমা সিন্ধু এবং পূর্ব্বসীমা ব্রহ্মপুত্রনদ বলা যাইতে পারে। আবার বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা ও পূর্ব্বোক্ত শতদ্রু, এই পাঁচটি করদনদীর মিলনে পঞ্চনদ বা সিন্ধুনদ উৎপন্ন হইয়াছে।

---

[১] এই অধ্যায়টি প্রথম শিক্ষার্থিগণ সর্ব্বশেষে পড়িতে পারেন।

হিমালয়পর্ব্বত বলিলেই সাধারণতঃ মনে হয় যে, উহা একটি অবিভক্ত পর্ব্বত। বস্তুতঃ তাহা নহে। উহাকে পর্ব্বতমালা বা শ্রেণী বলা উচিত। হিমালয়ের উত্তরপশ্চিম ভাগ অনেকগুলি পর্ব্বতে বিভক্ত। ঐ স্থানে গিরিসঙ্কট এবং নিম্ন উপত্যকা[1] দ্বারা পর্ব্বত বিভক্ত হইয়াছে। ঐ সকল বিচ্ছিন্ন পর্ব্বত পীরপঞ্জাল, মুসতাঘ বা করকোরম্[2] প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। ঐ সকল ছিন্ন পর্ব্বত ব্যতীত হিমালয়, পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রধানতঃ দুইটি প্রায় সমান্তর শাখা-পর্ব্বতে বিভক্ত হইয়াছে। ঐ দুইটি শাখার উত্তরটিতে যমুনোত্রি (২৫,৫০০ ফুট), নন্দাদেবী (২৫,৭০০ ফুট), ধবলগিরি (২৬,৮২৬ ফুট), কাঞ্চনজঙ্ঘা (২৮,১৫৬ ফুট), গৌরীশঙ্কর (২৯,০০২ ফুট) ইত্যাদি অত্যুচ্চ শৃঙ্গগুলি স্থানে স্থানে বিরাজ করিতেছে (১ চিত্র)। হিমালয়ের দক্ষিণ শাখাটিকে উপ-হিমালয় বলা যাইতে পারে। হিমালয় এবং উপ-হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী উপত্যকায় নেপাল, সিকিম ও ভূটান রাজ্য। উপ-হিমালয় অপেক্ষাকৃত অনুচ্চ পর্ব্বতমালায় গঠিত। প্রসিদ্ধ শিবালয়-পর্ব্বত এই শাখার অন্তর্গত। স্থানে স্থানে উপত্যকায় উহা বিভক্ত হইয়াছে। ঐ সমস্ত উপত্যকা তথায় দূন নামে খ্যাত। দেরাদূন, কাটামুণ্ড, দারজিলিং প্রভৃতি স্থান উপহিমালয়ে স্থিত। হিমালয়ের দক্ষিণ হইতে গঙ্গা বহির্গত হইয়া বঙ্গসাগরে পতিত হইয়াছে। গঙ্গা,

---

[1] দুইটি পর্ব্বতমালার মধ্যবর্ত্তী নিম্নস্থানকে উপত্যকা বলে। উপত্যকা হইলেই তাহাতে নদী প্রবাহিত থাকিবে। বস্তুতঃ, নদী দ্বারা অনেক উপত্যকা নির্ম্মিত হইয়াছে। যে দিকে পর্ব্বত দীর্ঘ, তাহার প্রস্থ দিকের নিম্ন স্থানকে গিরিসঙ্কট বলে। গিরিসঙ্কট প্রায়ই সংকীর্ণ এবং উপত্যকা প্রায়ই বিস্তৃত।

[2] প্রসিদ্ধ করকোরম্ গিরিসঙ্কট হইতে তাহার নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতেরও করকোরম্ নাম হইয়াছে। করকোরম্ গিরিসঙ্কট ১৮,৬০০ ফুট উচ্চ।

গণ্ডক, কূশী, ও তিস্তা প্রভৃতি কয়েকটি বড় বড় নদী, হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়া গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে।

হিমালয়পর্ব্বত পূর্ব্বপশ্চিমে প্রায় ১,৪০০ মাইল দীর্ঘ এবং উহার গড় উচ্চতা প্রায় ৩।৷০ মাইল। উহাতে যে সমস্ত গিরিসঙ্কট আছে, তৎসমুদয়ের অধিকাংশের উচ্চতা ৩ মাইল অপেক্ষা বেশী।

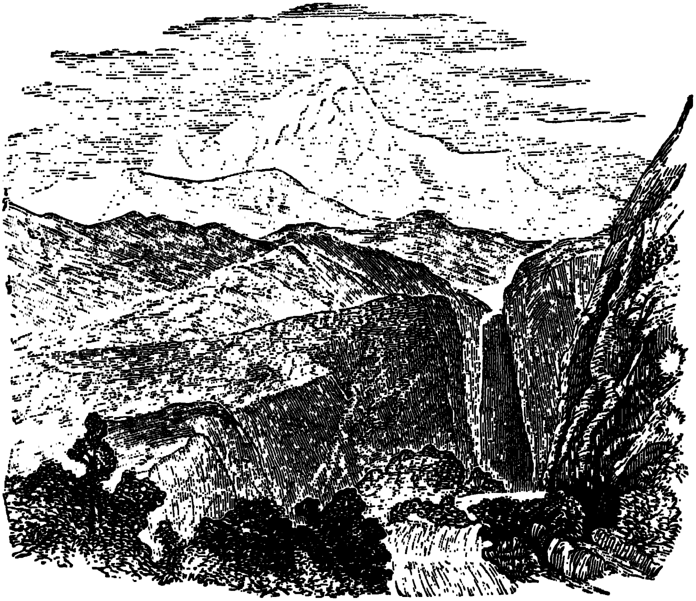

১ চিত্র। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ গৌরীশঙ্করের দৃশ্য।

৩। **সুলেমান-পার্ব্বত্যপ্রদেশ।** সিন্ধুদেশের পশ্চিমে সুলেমানপর্ব্বত সিন্ধুনদের সহিত প্রায় সমান্তর থাকিয়া উত্তর দক্ষিণে পঞ্জাবপ্রদেশ হইতে 'কাবুল অধিত্যকা পৃথক্ করিতেছে। ঐ পর্ব্বত সিন্ধুনদের উপত্যকা হইতে একবারে ঋজুভাবে উঠিয়াছে। উহার

সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ ১২,০০০ ফুটের কম। সুলেমানপর্ব্বতের দক্ষিণে ক্ষীরথর[১] পর্ব্বত, খিলাত ও বেলুচিস্থান হইতে সিন্ধুনদের সমভূমির[২] দক্ষিণাংশ পৃথক্ করিতেছে। ক্ষীরথরপর্ব্বত তিন সহস্র হইতে সাত সহস্র ফুট উচ্চ। এই দুই পর্ব্বতের মধ্যে বিখ্যাত বোলান-গিরিসঙ্কট (২ চিত্র)। সুলেমান পার্ব্বত্যপ্রদেশ নিতান্ত শুষ্ক। পারস্য ও বেলুচিস্থানের মরুভূমি হইতে শুষ্ক বাতাস প্রায় বার মাস বহে। সময়ে সময়ে সামান্য বৃষ্টি ও তুষারপাত না হইলে এবং বড় নদী না থাকিলে, ঐ স্থানটি মনুষ্যাদি প্রাণিবর্গের আবাস-যোগ্য হইত না।

৪। সিন্ধু ও গঙ্গার সমভূমি এবং থর-মরুভূমি।

ভারতের উত্তর ও পশ্চিমের পর্ব্বতমালার পাদদেশ হইতে গঙ্গা, সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্রের এবং উহাদিগের করদনদীর প্রকাণ্ড সমভূমি বিস্তৃত রহিয়াছে। এই সুবিস্তৃত সমভূমি আয়তনে প্রায় ৩,০০,০০০ তিনলক্ষ বর্গমাইল অর্থাৎ সমগ্র ভারতের প্রায় এক চতুর্থাংশ। ভারতের মধ্যে এরূপ ধনধান্যপরিপূর্ণ ও বহুজনাকীর্ণ স্থান আর নাই। আসাম, বাঙ্গালা, বেহার, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, অযোধ্যা, পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ, উত্তরে হিমালয়, পশ্চিমে সুলেমান ও ক্ষীরথর পর্ব্বত, পূর্ব্বে আসাম, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পাহাড় এবং দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত ও দক্ষিণাপথের উচ্চ অধিত্যকাভূমি, এই চতুঃসীমার মধ্যে সিন্ধু ও গঙ্গার সমভূমিতে অবস্থিত। এই সমভূমি উত্তরপশ্চিম হইতে পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে ক্রমশঃ নিম্ন হইয়াছে। কিন্তু উহার কোনও অংশ সমুদ্র-জলসীমা হইতে সহস্র ফুটের বেশী উচ্চ নহে। ভারতের সমুদ্র-

---

[১] অনেক মানচিত্রে ঐ পর্ব্বতের হালা নাম দিয়াছে। বস্তুতঃ, হালা নামক কোন পর্ব্বত তথায় নাই। তবে হালা গিরিসঙ্কট আছে, তাহা অনেক দূর।

[২] অনুচ্চ, পর্ব্বতাদিহীন বিস্তৃত ভূমিকে সমভূমি বলে।

জলসীমা হইতে সহস্র ফুটের কম নিম্ন ও সহস্র ফুটাধিক উচ্চ স্থান সকল দ্বিতীয় মানচিত্রে দেখান গেল।

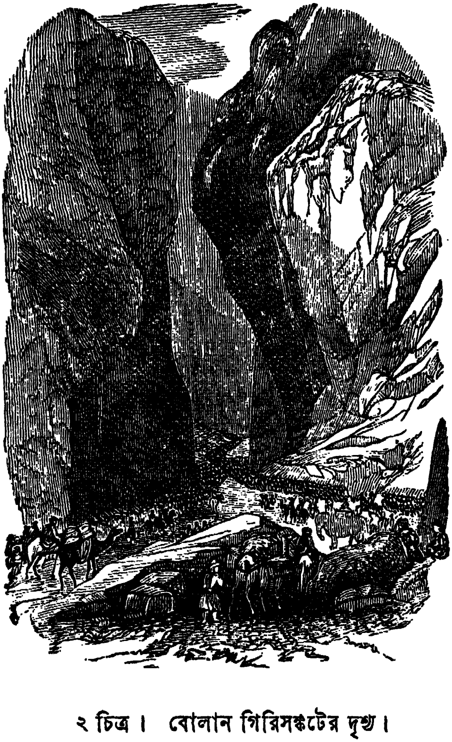

২ চিত্র। বোলান গিরিসঙ্কটের দৃশ্য।

সিন্ধু ও গঙ্গার সমভূমি, সামান্যতঃ সৈন্ধব ও গাঙ্গেয় সমভূমিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। সিন্ধুর সমভূমির পশ্চিমাংশ নিতান্ত শুষ্ক। এই অংশে সিন্ধুনদের পলিময় প্রদেশ, কচ্ছ-প্রদেশের জলাভূমি এবং যশল্মীর ও বিকানীরের অনুর্ব্বরা মরুভূমি রহিয়াছে। পূর্ব্বাংশে লূনানদী বহমান থাকাতে, ঐ স্থানমাত্র উর্ব্বরা। এই প্রদেশের অধি-

কাংশ স্থানে বৃষ্টিপাত নিতান্ত অল্প; এমন কি, সময়ে সময়ে বৎসর পার হইয়া যায়, এক বিন্দুও বৃষ্টি পতিত হয় না। পঞ্জাবের উত্তরাংশ এবং সৈন্ধবসমভূমির পূর্ব্বাংশে স্থিত আরাবল্লী-পর্ব্বতপ্রদেশে শীত ও বর্ষাকালে বৃষ্টি অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়াতে, তথায় প্রচুর গোধূম উৎপন্ন হয়।

যশল্মীর ও বিকানীরের মরুভূমিকে সাধারণতঃ থূর-মরুভূমি বলে। কিন্তু মরুভূমি বলিলে যেরূপ সাহারার ন্যায় বৃষ্টি, জল ও তৃণাদিহীন বালুকারাশি মনে হয়, থূর-মরুভূমি সেরূপ নহে। এই মরুভূমি একেবারে বসতি বা তৃণাদিহীন নহে। ইহার স্থানে স্থানে হুড়হুড়িয়া প্রভৃতি তৃণগুল্মাদি, স্থানে স্থানে বৃক্ষাদি জন্মিয়া, স্থানে স্থানে গ্রাম-সংস্থাপনের সহায়তা করিয়াছে। উষ্ট্র, গো, ছাগ প্রভৃতি পশুও ঐ স্থানে চরিয়া বেড়ায়। কিন্তু আবার স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ৪০০।৫০০ ফুট উচ্চ বালুকা-পাহাড় পূর্ব্বপশ্চিম দিকে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে।

উপরে উক্ত হইয়াছে যে, গাঙ্গেয় সমভূমি উত্তরপশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে ক্রমশঃ ঢালু হইয়াছে। ঐ ঢালু ভূমিতে গঙ্গা প্রবাহিত হইতে হইতে দক্ষিণ দিকে যমুনা, চম্বল, শোণ এবং উত্তরে গগ্রা, গণ্ডক প্রভৃতি নদী হইতে জলরাশি গ্রহণ করিতেছে। এই বিস্তৃত সমভূমিতে বৎসরের মধ্যে দুই বিপরীত দিক্ হইতে বাতাস বহিয়া থাকে। বঙ্গসাগর হইতে গ্রীষ্মকালে প্রচুর জলীয়বাষ্পমিশ্রিত বাতাস বহাতে বৃষ্টি হয়। উত্তরপশ্চিম ভাগে প্রচুর গোধূম ও দক্ষিণপূর্ব্বাংশে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হওয়াতে, এই ভূমি শস্যশ্যামলা হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে আর্য্যেরা এই স্থানে প্রথমে বাস করেন; এজন্য সিন্ধুগঙ্গার সমভূমিকে আর্য্যাবর্ত্ত বলা যায়।

৫। আসাম ও কাছাড় উপত্যকা। আসাম উপত্যকা দিয়া ব্রহ্মপুত্রনদ প্রবাহিত হইতেছে। ইহার উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে

গারো, খাসিয়া ও নাগা পাহাড়। এই তিন পাহাড়ের দক্ষিণে কাছাড় উপত্যকা। এই উপত্যকার দক্ষিণে ত্রিপুরা ও লুসাই পাহাড় এবং অধিকাংশস্থলে জলা ও বিল। এই দুই উপত্যকায় প্রচুর বৃষ্টি হয়। এখানকার বায়ু নাতিশীতোষ্ণ এবং আর্দ্র।

৬। বিন্ধ্য ও সাতপুর পার্ব্বত্য-প্রদেশ। সমগ্র ভারত একটি পর্ব্বতমালা দ্বারা দুই অসমান অংশে বিভক্ত হইয়াছে। এই পর্ব্বতমালার উত্তরভাগ আর্য্যাবর্ত্ত বা সিন্ধুগঙ্গার সমভূমি এবং দক্ষিণভাগ দাক্ষিণাত্য। সিন্ধুগঙ্গার সমভূমির ঠিক দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি এবং বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণে সাতপুরপর্ব্বত। এই দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী উপত্যকায় নর্ম্মদানদী পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে প্রবাহিত হইতেছে। হাজারিবাগ, ছোটনাগপুর প্রভৃতি স্থানসকল বিন্ধ্যপর্ব্বতের পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত বলা যাইতে পারে। সাতপুর ও বিন্ধ্যপর্ব্বত দ্বারা ঐ প্রদেশের বাতাসের দিক্ পূর্ব্বে ও পশ্চিমে হইয়া পড়ে। পশ্চিমে আরবসাগর হইতে বাতাস প্রবাহিত হইয়া এস্থানে প্রচুর বৃষ্টি পতিত হয়। ইহার অধিকাংশ স্থল শিশু প্রভৃতি আরণ্য বৃক্ষের জঙ্গলে এবং পাহাড়িয়া জাতিতে পূর্ণ।

৭। মালব ও বুন্দেলখণ্ড অধিত্যকা। দক্ষিণপশ্চিমে বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে পূর্ব্বদিকে শোণনদ পর্য্যন্ত মালব ও বুন্দেলখণ্ড অধিত্যকা-ভূমি[১]। বস্তুতঃ যাহাকে বিন্ধ্যপর্ব্বত বলা যায়, তাহা ঐ অধিত্যকার দক্ষিণ ও পূর্ব্ব প্রান্তমাত্র। এই সমস্ত ভূমিতে যত বৃষ্টি হয়, তাহার জল গঙ্গা দ্বারা বাহিত হইয়া বঙ্গসাগরে পতিত হইয়া থাকে। এই অধিত্যকার পশ্চিমে আরাবল্লীপর্ব্বত আমেদাবাদ হইতে প্রায় দিল্লী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আবুশৃঙ্গ (৫,০০০ ফুট) নামে ইহাতে একটি মাত্র শৃঙ্গ আছে। এখানে বাতাস সচরাচর দক্ষিণপশ্চিম দিক্ হইতে বহে।

---

[১] "সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে সহস্রাধিক ফুট উচ্চ বৃহদায়তন সমস্থলকে অধিত্যকা বলা যায়"।

৮। **দাক্ষিণাত্য-অধিত্যকা।** দাক্ষিণাত্য-অধিত্যকার উত্তরে সাতপুর পর্ব্বত, পশ্চিমে সহ্যাদ্রি বা পশ্চিমঘাট পর্ব্বত এবং পূর্ব্বে পূর্ব্বঘাট পর্ব্বত। এই অধিত্যকা এবং সমুদ্রের মধ্যে তিন দিকেই নিম্নভূমি রহিয়াছে (২ মানচিত্র)। দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম পার্শ্বে সহ্যাদ্রি সমুদ্রের খুব নিকটে থাকিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ব দিকে দাক্ষিণাত্য ক্রমনিম্ন হইয়া অনেকখানি স্থানে সমভূমিতে পরিণত হইয়াছে। সাতপুরপর্ব্বতের দক্ষিণেই তাপ্তীনদীর এবং পূর্ব্বভাগে গোদাবরীনদীর উপত্যকা। গোদাবরীনদীর উপত্যকা দাক্ষিণাত্য অধিত্যকার মধ্যে নিম্নতম দেশ। এই নদী বেরার ও নিজাম রাজ্য মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। ইহারই দক্ষিণে কৃষ্ণা পার্ব্বত্যপ্রদেশে প্রবাহিত হওয়াতে ঐস্থানে একটি উপত্যকা হইয়াছে। গোদাবরীর পূর্ব্বোত্তরাংশে মহানদীর উপত্যকা। নাগপুর ও গোদাবরীর উপত্যকার পূর্ব্বাংশে স্থিত ছত্রিশগড় পাহাড়ে প্রদেশ হইতে মহানদী উৎপন্ন হইয়া কটকের নিকট একটি অতিসঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্ম ভেদ করিয়া বঙ্গসাগরে পতিত হইয়াছে। উড়িষ্যার পাহাড়ে প্রদেশ ভারতের মধ্যে নিতান্ত জঙ্গলময়।

সহ্যাদ্রি পর্ব্বত ভারতের পশ্চিমপার্শ্বে তাপ্তীনদী হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উহার গড় উচ্চতা ২,০০০ ফুট। ভারতের পূর্ব্বপার্শ্বে পূর্ব্বঘাট নামক একটি পর্ব্বত আছে, অনেকে ভাবিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক সহ্যাদ্রির ন্যায়, পূর্ব্ব পার্শ্বে কোন পর্ব্বত নাই। যাহাকে সচরাচর পূর্ব্বঘাট বলে, তাহার অধিকাংশ দাক্ষিণাত্যের অধিত্যকার পূর্ব্ব প্রান্তমাত্র। তবে দাক্ষিণাত্যের উত্তরদক্ষিণ ভাগের পূর্ব্বপার্শ্বে কয়েকটি পাহাড় আছে। উত্তর ভাগের পাহাড়গুলির অধিকাংশ উড়িষ্যার পাহাড় এবং দক্ষিণ ভাগে মাদ্রাজের নিকট তিন শ্রেণী পাহাড়

রহিয়াছে। ইহাদিগের অধিকাংশস্থল কঠিনশিলাময় ও তৃণাদিবিহীন। কাদাপা মাদ্রাজবিভাগের মধ্যে উচ্চতম স্থল।

পূর্ব্বঘাট-গিরি সহ্যাদ্রির সহিত মহীশূরের দক্ষিণে মিলিত হইয়াছে। উহাদিগের মিলন-স্থলে নীলগিরি-পর্ব্বত। দোদাবেত্তা নামক শৃঙ্গ (৮,৬৪০ ফুট) উহার সর্ব্বোচ্চ স্থান। নীলগিরির দক্ষিণে অনমলয়, অগস্ত্যমলয় প্রভৃতি এবং ত্রিবাঙ্কোড়ের অনেকগুলি পাহাড় আছে। নীলগিরি-পাহাড়ের দক্ষিণে কাবেরী নদী। এই নদীর ত্রিকোণ-মণ্ডলভূমি তাঞ্জোরের মধ্যে সাতিশয় শস্যশালিনী। বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময় দাক্ষিণাত্যে দক্ষিণপশ্চিম দিক্ হইতে বাতাস বহিয়া থাকে। ঐ বাতাস আরবসাগর হইতে প্রচুর জলীয় বাষ্প লইয়া দাক্ষিণাত্যে বারি বর্ষণ করে।

৯। সিংহল ও বঙ্গসাগরের দ্বীপ। মন্নার উপসাগর এবং পকপ্রণালী দ্বারা ভারত হইতে সিংহল পৃথক্ রহিয়াছে। কিন্তু এই মধ্যবর্ত্তী সাগরটি প্রবালদ্বীপ এবং প্রবালচরবশতঃ অগভীর হইয়াছে। সিংহলের দক্ষিণাংশে ৬০০০।৭০০০ সহস্র ফুট উচ্চ পাহাড় রহিয়াছে। সর্ব্বদা বেশী বৃষ্টিপাত এবং বায়ু নাতিশীতোষ্ণ হওয়াতে সিংহলে উদ্ভিদবর্গের খুব পরিপুষ্টি দেখা যায়।

বঙ্গসাগরের দ্বীপের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং নরকোন্দম ও বারেণ নামক আগ্নেয়দ্বীপ প্রধান। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ নিবিড় অরণ্যময়। প্রবালদ্বীপ ও চর থাকাতে ঐ সমুদয় দ্বীপের নিকট জাহাজ সহজে যাইতে পারে না। বারেণদ্বীপের ব্যাস প্রায় ১৸০ মাইল। উহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ প্রায় ১০০০ ফুট উচ্চ। এক্ষণে উহার উৎক্ষেপ হয় না। নরকোন্দম গিরিও ব্যারেণগিরির ন্যায় সমুদ্র হইতে একবারে ১,৩০০ ফুট উচ্চে উঠিয়াছে। ইহাও যে একটি আগ্নেয় গিরি, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

২ মানচিত্র।

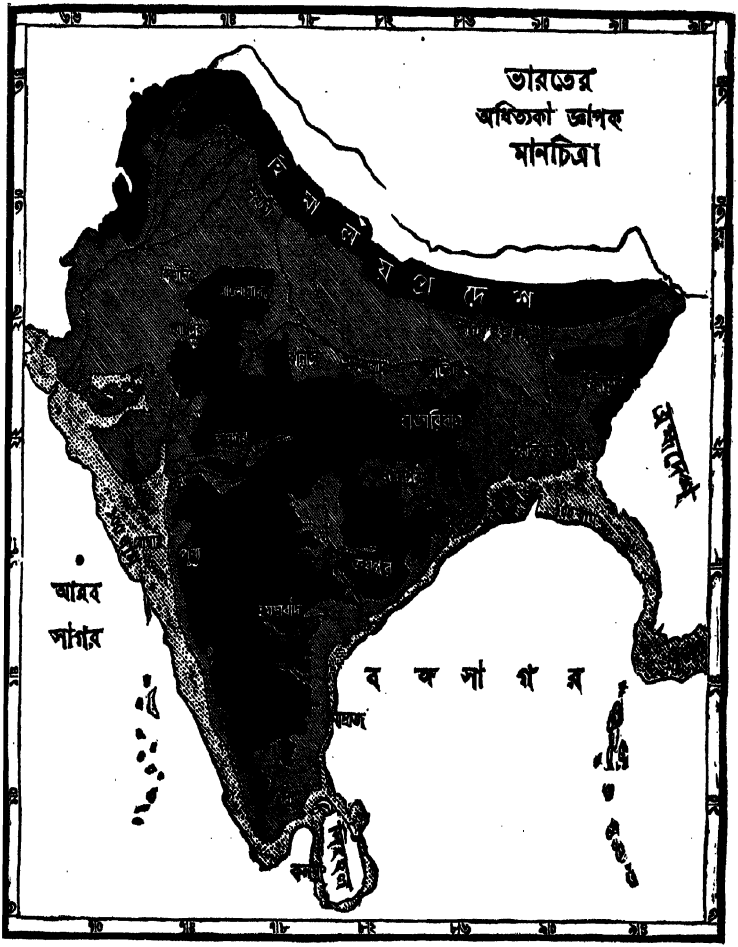
ভারতের
অধিত্যকা জ্ঞাপক
মানচিত্র।
হিমালয় প্রদেশ
আরব সাগর
বঙ্গ সাগর
ব্রহ্মদেশ
মাদ্রাজ
সিংহল
কলম্বো

গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ স্থানসমুদয় সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১,০০০ ফুট কিম্বা ততোধিক উচ্চ। রেখাঙ্কিত স্থানসকল সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১,০০০ ফুটের কম উচ্চ। ভারত-ভূমির পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব্বভাগে ১০০ বামের রেখা অঙ্কিত আছে। বঙ্গ ও আরব সাগরের জল ১০০ শত বাম কমিয়া যাইলে ঐ রেখা পর্য্যন্ত সাগরের তলদেশ শুষ্ক ভূমিতে পরিণত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বায়ু-মণ্ডল।

১ § বায়ুর উপাদান, উষ্ণতা ও চাপ।

১০। **বায়ু-মণ্ডল।** বায়ু পৃথিবীর আবরণ-স্বরূপ হইয়া উহার চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। যেরূপ মৎস্যাদি জলজন্তু জলরাশির মধ্যে সচ্ছন্দে বিচরণ করে, তদ্রূপ মনুষ্য, পশুপক্ষী, কীট, পতঙ্গ, প্রভৃতি এই বায়ুরাশির মধ্যে নিয়ত বাস করিতেছে। আমরা বায়ু দেখিতে পাই না, কিন্তু উহার অস্তিত্ব সর্ব্বদা অনুভব করি। হাত কিম্বা পাখা সঞ্চালন করিলে বায়ুর অস্তিত্ব বেশ জানা যায়। যখন বায়ু প্রবল ঝড়রূপে প্রবাহিত হইয়া বৃক্ষলতা, ঘরদ্বার উৎপাটন-পূর্ব্বক আমাদিগের ভীতির কারণ হয়, তখন, উহা যে সামান্য পদার্থ নয়, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। পৃথিবীর আবরণ-স্বরূপ এই বায়ুরাশিকে বায়ুমণ্ডল বলা যায়।

১১। **বায়ুর উপাদান।** বায়ু একটি মিশ্র পদার্থ। পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় যে, উহা প্রধানতঃ অম্লজনক ও যবক্ষারজনক নামক দুইটি অদৃশ্য, বর্ণ, স্বাদ ও গন্ধবিহীন গ্যাসের[১] সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে। মাপে ১০০ সের বায়ুতে প্রায় ২১ সের অম্লজনক গ্যাস এবং ৭৯ সের যবক্ষারজনক গ্যাস আছে।

অম্লজনক গ্যাসকে প্রাণপ্রদ গ্যাস বলা যাইতে পারে। কি স্থলচর পশুপক্ষ্যাদি, কি জলচর মৎস্যশম্বুক, কি বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ, সমুদয়

---

[১] সরল পদার্থ-বিজ্ঞান ৩৫ প্রকরণ।

জীব,[১] অম্লজনক গ্যাস নিশ্বাসক্রিয়া দ্বারা স্বস্ব দেহে অবিশ্রান্ত টানিয়া লইয়া জীবিত রহিয়াছে। জলে বায়ু, বিশেষতঃ অম্লজনক গ্যাস, মিশ্রিত হয়; এজন্য জলমধ্যে থাকিয়া মৎস্যাদিপ্রাণী এবং শৈবালাদি উদ্ভিদ জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হয়। আবার, সকলেই প্রশ্বাসক্রিয়া দ্বারা অঙ্গারকাম্ল নামক গ্যাস বায়ুতে প্রদান করিতেছে। এই শেষোক্ত গ্যাসটি অত্যন্ত বিষাক্ত। সচরাচর মাপে ১০,০০০ সের বায়ুতে কেবল মাত্র ৪ সের অঙ্গারকাম্ল গ্যাস আছে। বায়ুতে এই গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে উহা বিষাক্ত হইয়া জীবগণের প্রাণনাশক হইয়া পড়ে। এজন্য করুণাময় বিশ্বনিয়ন্তা অঙ্গারকাম্ল গ্যাসকে উদ্ভিদের একটি প্রধান খাদ্য করিয়া বিচিত্র শৃঙ্খলা সংস্থাপন করিয়াছেন। বাস্তবিক বায়ুস্থিত অঙ্গারকাম্লগ্যাস উদ্ভিদবর্গ হরিদ্‌বর্ণ পত্র ও শাখা দ্বারা দেহে শোষণ করিয়া দেহ হইতে অম্লজনক গ্যাস প্রত্যর্পণ করিতেছে।

অম্লজনক, যবক্ষারজনক ও অঙ্গারকাম্ল গ্যাস ব্যতীত বায়ুতে অন্যান্য দুই একটি গ্যাস আছে। তাহাদিগের পরিমাণ যৎসামান্য হওয়াতে এস্থলে উল্লেখ করা গেল না। কিন্তু বায়ুতে যে ধূলিকণিকা আছে, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। কোনও অন্ধকারময় গৃহে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিলে বায়ুতে ভাসমান ধূলিকণিকা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এজন্য বাক্স, পুস্তক প্রভৃতি দ্রব্যসকল কয়েক দিবস ফেলিয়া রাখিলে, উহারা ধূলিময় হয়।

উপরিবর্ণিত দ্রব্যসকল ব্যতীত, বায়ুতে যথেষ্ট পরিমাণে জলীয় বাষ্প সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে। জলীয় বাষ্প বায়ুর ন্যায় অদৃশ্য

[১] বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ এবং মনুষ্য পশু কীটাদি প্রাণিবর্গ লইয়া জীব। মনুষ্যাদি প্রাণিবর্গের ন্যায় বৃক্ষলতাদি সমুদয় উদ্ভিদের জন্ম, মৃত্যু, পরিপুষ্টি প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়া আছে। এজন্য উদ্ভিদবর্গকে জীব-শ্রেণী মধ্যে ধরা যায়।

পদার্থ। বায়ুতে আর্দ্রবস্ত্র রাখিলে উহা শুকাইয়া যায় অর্থাৎ বস্ত্রের জল বাষ্পাকারে বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়। তদ্রূপ, সমুদ্র, নদী, পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়, আর্দ্রভূমি, বৃক্ষলতা, আমাদিগের দেহ ইত্যাদি যাবতীয় সরস পদার্থ হইতে, কি রাত্রি, কি দিবা, কি শীত, কি গ্রীষ্ম সকলসময়ই বাষ্প উদ্ভূত হইয়া বায়ুকে বাষ্পময় রাখিতেছে। এতদ্বিষয় পরে বিশেষরূপে বলা যাইবে।

১২। **বায়ুর উষ্ণতা।** বিভিন্ন বস্তু স্পর্শ করিলে কোনটি শীতল, কোনটি উষ্ণ, কোনটি অল্প শীতল, কোনটি অল্প উষ্ণ বোধ হয়। কিন্তু স্পর্শ দ্বারা বস্তুসমূহের উষ্ণতা বা শীতলতার তারতম্য সম্যক্ অবগত হওয়া যায় না; এজন্য দ্রব্যাদির উষ্ণতা নির্দ্ধারণার্থ তাপমান নামক যন্ত্র[1] ব্যবহৃত হয়। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে ও তত্ত্বে শতাংশিক নামক তাপমানযন্ত্র অধিকাংশ স্থলে প্রচলিত। কিন্তু ইংলণ্ডে সচরাচর ফারণহিট নামক সাহেবকৃত তাপমান-যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ইংরাজেরা আমাদের দেশেও ঐ ফারণহিটের তাপমান-যন্ত্র ব্যবহার করিয়া বায়ুর উষ্ণতা নিরূপণ করিয়া থাকেন। পাঠকবর্গের স্মরণার্থ বলা আবশ্যক যে, ফারণহিটের তাপমান-যন্ত্রের ৩২° অংশে বিশুদ্ধ জল জমিয়া বরফ হয় এবং ২১২° অংশে বিশুদ্ধ জল সচরাচর ফুটিতে থাকে। পার্শ্বে ফারণহিটের তাপমান-যন্ত্রের এক প্রতিমূর্ত্তি দেওয়া গেল।

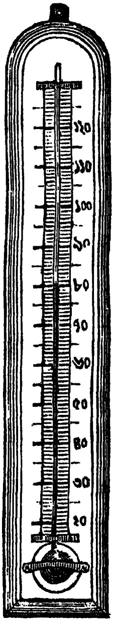

৩ চিত্র[2]।

বায়ুর উষ্ণতার সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন হইতেছে। শীত-

---

[1] সরল পদার্থ-বিজ্ঞানের ৭৮ প্রকরণ।

[2] বায়ুর উষ্ণতা ফারণহিটের তাপমান যন্ত্রের ১২০° অংশের প্রায় বেশী হয় না। এজন্য উহার উপরের অঙ্কগুলি সচরাচর দেওয়া থাকে না।

কালের ও গ্রীষ্মকালের বায়ুর উষ্ণতার কত প্রভেদ, তাহা সকলেই জানেন। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের বেলা ২।৩টার সময় কত দারুণ গ্রীষ্ম এবং পৌষমাঘের রাত্রি ৫।৬ টার সময় কত শীত! এখানে বিভিন্ন মাসের উষ্ণতার উল্লেখ করিলাম। কিন্তু কি শীতকাল কি গ্রীষ্মকাল, একই দিবসের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বায়ুর উষ্ণতা একরূপ দেখা যায় না। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের অতি প্রত্যূষে ঠাণ্ডা বোধ হয়। বেলা বৃদ্ধির সঙ্গেসঙ্গে বায়ুর উষ্ণতা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বেলা ২।৩টার সময় উষ্ণতা বৃদ্ধির চরমসীমায় উপনীত হয়। সূর্য্যাস্তের পর আবার শীতল হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ৫।৬ টার সময় শৈত্যের অর্থাৎ উষ্ণতাহ্রাসের চরমসীমায় উপস্থিত হয়। এইরূপ পৌষ মাসের কোন এক দিবসের উষ্ণতা দেখিলে সেই দিবসের বেলা ২।৩টার সময় উষ্ণতার বৃদ্ধির চরমসীমা এবং রাত্রি ৫।৬ টার সময় উষ্ণতার হ্রাসের চরমসীমা দেখা যায়। এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, বায়ুর উষ্ণতার ঘণ্টায় ঘণ্টায় হ্রাসবৃদ্ধি হয়। কেবল ইহাই নহে, আজ যে প্রকার গরম, কল্য হয়তঃ তত ছিল না, আবার আগামী কল্য অন্যরূপ হইবে। অর্থাৎ যে কোন মাস ধরা যাউক, সেই মাসের প্রত্যেক দিবসের উষ্ণতা একরূপ নহে।

অতএব আমরা উপরে দেখিলাম যে, প্রত্যেক স্থানে, (১) ঘণ্টায় ঘণ্টায়, (২) দিনে দিনে, এবং (৩) মাসে মাসে, বায়ুর উষ্ণতার হ্রাসবৃদ্ধি হইতেছে। আবার, বিভিন্ন স্থানের একই দিবসের একই সময়ে বায়ুর উষ্ণতার প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। বৈশাখ মাসে কলিকাতা যত গরম, তদপেক্ষা পাটনা অধিক গরম, এবং হাজারিবাগ অধিক ঠাণ্ডা। এতদ্বিষয় পরে বলা যাইবে।

১৩। বায়ু কি প্রকারে উত্তপ্ত হয়। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বায়ুর উষ্ণতার হ্রাসবৃদ্ধি বুঝিবার পূর্ব্বে বায়ু কি প্রকারে উত্তপ্ত হয়,

তাহার বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক। আমরা কোথা হইতে তাপ পাই, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। দুই প্রহরের সময় অনাবৃত স্থানে থাকা অসহ্য বোধ হয়। তখন সূর্য্যের প্রখর তাপে জলস্থল, প্রাণী উদ্ভিদ সমুদয় উত্তপ্ত হইয়া উঠে। সূর্য্যই যে আমাদিগের এক মাত্র তাপদাতা, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু কিয়ৎ পরিমাণে পৃথিবী তাহার নিজের তাপদ্বারা উত্তপ্ত থাকে। এবিষয় পরে বলা যাইবে।

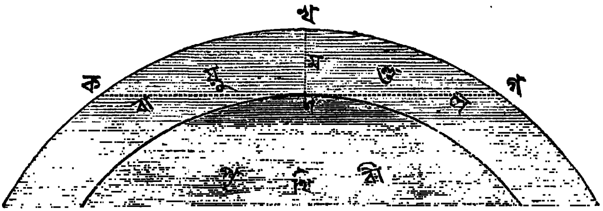

৪ চিত্র। সূর্য্যকিরণ বায়ু ভেদ করিয়া আসিবার সময় তদ্দ্বারা শোষিত হয়।

বায়ু ত্রিবিধ প্রণালীতে উত্তপ্ত হয়। (১) সূর্য্যের কিরণ পৃথিবীর দিকে আসিবার সময়, উহাকে বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া আসিতে হয়। তখন উহার কিয়দংশ বায়ুদ্বারা শোষিত হয় (৪ চিত্র)। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে সূর্য্যের কিরণ অনেকখানি বায়ু (ক দ, গ দ) ভেদ করিয়া আইসে, তজ্জন্য তখন অনেকখানি তাপ শোষিত হয়। মধ্যাহ্নকালে যখন সূর্য্য মস্তকোপরি আইসে, তখন অল্পতর বায়ু (খ দ) ভেদ করিয়া আসিতে হয়, এজন্য তখন সূর্য্যকিরণ অপেক্ষাকৃত অল্প শোষিত হয়। উক্ত কারণবশতঃ আমরা প্রাতঃকালের ও সন্ধ্যাকালের সূর্য্যের দিকে তাকাইতে পারি। কিন্তু মধ্যাহ্নের সূর্য্য দৃষ্টি করা দুঃসাধ্য ও চক্ষুর বিপজ্জনক। পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন যে, সূর্য্য ঠিক মস্তকোপরি থাকিলেও, তাহার সমস্ত তাপের প্রায় একচতুর্থাংশ কেবল নির্ম্মল বায়ুরাশি দ্বারা শোষিত হয়। অবশিষ্ট তাপ পৃথিবীর পৃষ্টদেশে

পতিত হইয়া উহাকে উত্তপ্ত করে। (২) বায়ু এই উত্তপ্ত পৃষ্টদেশের সংস্পর্শে আসিয়া স্বয়ং উত্তপ্ত হয়। উত্তপ্ত হওয়াতে ঐ বায়ু লঘু হইয়া উপরে উঠে, এবং অপর শীতল সুতরাং অপেক্ষাকৃত ভারি বায়ু আসিয়া তাহার স্থান পূর্ণ করে। এইরূপে প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া বায়ুরাশি উত্তপ্ত হইতে থাকে। এবং (৩) পৃথিবীতে পতিত ও তদ্দ্বারা শোষিত কিরণ ক্রমাগত বায়ুতে পরাবর্ত্তিত ও বিকীর্ণ হইতে থাকে। এজন্য বায়ুদ্বারা ঐ তাপের আবার কিয়দংশ শোষিত হয়।

নির্ম্মল বায়ু অপেক্ষা জলীয় বাষ্পের তাপ-শোষকতা ক্ষমতা অধিক। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, বায়ুতে অল্পাধিক পরিমাণে জলীয় বাষ্প সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। এজন্য বায়ুতে অধিক পরিমাণে জলীয় বাষ্প থাকিলে, তদ্দ্বারা অধিক পরিমাণে সূর্য্যতাপ শোষিত হয়। মেঘসমূহও সূর্য্যতাপ অধিক শোষণ করে। মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রের সময় মস্তকোপরি একখণ্ড মেঘ আসিলে উত্তাপের কত লাঘব হয়, তাহা বোধ হয়, সকলেই অনুভব করিয়া থাকিবেন।

১৪। বায়ুর উষ্ণতার প্রতিঘণ্টায় পরিবর্ত্তনের কারণ।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, দিবসের মধ্যে বেলা ২। ৩ টার সময় বায়ুর উষ্ণতা সর্ব্বোচ্চ এবং ভোর ৪। ৫ টার সময় সর্ব্বাল্প হয়। এরূপ ঘটিবার কারণ দেখা যাউক।

কি শীতল কি উষ্ণ দ্রব্য, সকল সময়েই বিকিরণ প্রণালীতে উহার তাপ নষ্ট হইতেছে এবং সকল সময়েই উহা অন্যান্য চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী দ্রব্যাদি হইতে অল্পাধিক তাপ গ্রহণ করিতেছে। এরূপ স্থলে সহজেই বুঝা যায় যে, পৃথিবী সূর্য্য হইতে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যতখানি তাপ গ্রহণ করে, যদি সেই সময়ের মধ্যে বিকিরণ দ্বারা উহার তদপেক্ষা কম তাপ নষ্ট হয়, তবে পৃথিবীতে কিয়দংশ তাপ সঞ্চিত

থাকিয়া যায়, সুতরাং বায়ুর উষ্ণতাও বৃদ্ধি পায়। প্রাতঃকাল হইতে সূর্য্য যতই মস্তকোপরির নিকটে আসিতে থাকে, ততই বেশী তাপ পৃথিবী পাইতে থাকে। এতখানি তাপ ঐ সময়ের মধ্যে বিকীর্ণ হয় না। কিন্তু মধ্যাহ্নের পর সূর্য্যকিরণ তির্য্যক্‌ভাবে আসিতে থাকে, এজন্য পৃথিবী এখন হইতে ক্রমশঃ কম তাপ পাইতে থাকে। বিকিরণবশতঃ তাহার অধিকাংশ আবার নষ্ট হয়। এজন্য সন্ধ্যার সময় উষ্ণতা কম অনুভূত হয়। মধ্যাহ্নের কিঞ্চিৎ পরেও পৃথিবী সূর্য্যতাপ যথেষ্ট পাইতে থাকে। এনিমিত্ত উষ্ণতার চরমসীমা ঠিক দুই প্রহরের সময় না হইয়া ২।৩ টার সময় দৃষ্ট হয়। রাত্রিকালে আমরা সূর্য্য হইতে কিছুমাত্র তাপ পাই না, কিন্তু বিকিরণদ্বারা তাপ ক্রমাগত নষ্ট হয়। ক্রমাগত বিকিরণ হওয়াতে ভোর ৫।৬ টার সময় উষ্ণতা খুব কম হয়।

১৫। দিবসের গড় উষ্ণতা। সমস্ত দিবসের মধ্যে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বায়ুর উষ্ণতার পরিবর্ত্তন হইতেছে। মনে কর, দিবারাত্রির মধ্যে ২৪ বার উষ্ণতা নিরূপণ করা গেল। এই ২৪টি উষ্ণতা যোগ করিয়া সমষ্টিকে ২৪ ভাগ করিলে, ঐ দিবসের গড় উষ্ণতা পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, গত ১০ই বৈশাখ কলিকাতায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় যে উষ্ণতা নিরূপিত হয়, তন্মধ্য হইতে ঐ দিবসের ছয় বারের উষ্ণতা একত্র করিয়া দিবসের গড় উষ্ণতা নিরূপণ করিবার প্রণালী দেখান গেল।

মধ্য রাত্রি—৮২.৭
ভোর ৪টা— ৮২.৬
প্রাতে ৮টা—৮৩.২
মধ্যাহ্ন—— ৯২.৬
বেলা ৪টা— ৯২.৫
রাত্রি ৮টা— ৮২.৩

সমষ্টি ৫১৫.৯

দৃষ্টির সংখ্যা ৬ দিয়া ঐ সমষ্টিকে ভাগ করিলে (৫১৫.৯ ÷ ৬=) ৯৫.৬°ফা উক্ত দিবসের গড় উষ্ণতা পাওয়া গেল।

এইরূপে কোন স্থানের কোন বৎসরের কোন মাসের সমুদায় দিবসের গড় উষ্ণতা যোগ করিয়া সেই মাসের দিবসের সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে ঐ স্থানের ঐ মাসের গড় উষ্ণতা পাওয়া যায়। অনেক বৎসরের ঐ মাসের গড় উষ্ণতা একত্র করিয়া বৎসরের সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে, ঐ স্থানের ঐ মাসের গড় উষ্ণতা পাওয়া যায়। বিভিন্ন স্থানের গড় উষ্ণতা জানা থাকিলে, কোন স্থান অপর কোন স্থান অপেক্ষা গরম কি শীতল, তাহা অবগত হওয়া যায়।

১৬। বায়ুর গুরুত্ব। কোন তরল পদার্থ তাপপ্রয়োগে বাষ্পীভূত করিলে, তাহার বাষ্পের আয়তন উক্ত তরল পদার্থের আয়তন অপেক্ষা অনেক গুণে বড় হয়। কিন্তু আয়তনে বড় হইলেও তাহার ভারের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না। এক সের জল বাষ্পীভূত করিলে এক সেরমাত্র বাষ্প পাওয়া যায়। অধিকাংশ গ্যাস ও বাষ্প[১] অদৃশ্য ও নিতান্ত হাল্‌কা হইলেও তাহাদিগের ভার আছে। জল অপেক্ষা বায়ু প্রায় ৮০০ আটশত গুণ লঘু। অল্পপরিমিত বায়ুর ভার নিতান্ত অল্প বলিয়া অনেকখানির ভার অল্প নহে। বাস্তবিক, ওজন করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এক ঘনফুট বায়ুর ভার প্রায় ৩ তোলা। মনে কর, কোন ঘর ১৫ ফুট লম্বে, ৯ ফুট প্রস্থে এবং ১২ ফুট উচ্চে। অতএব ঐ ঘরে ১৫ × ৯ × ১২ বা ১৬২০ ঘন ফুট বায়ু আছে। ইহার ভার $\frac{১৬২০\times৩}{৮০\times৪০}$ মণ অর্থাৎ প্রায় ১॥০ মণ।

১৭। বায়ুর চাপ। বায়বীয় পদার্থের ধর্ম্মই এই যে, তাহা চারিদিকের সীমগ্রীতে চাপ প্রয়োগ করে, এজন্য এবং বায়ুর ভার-

---

[১] সরল পদার্থ-বিজ্ঞান ৩৫ প্রকরণ।

বশতঃ উহা পৃথিবীস্থ যাবতীয় বস্তুকে চাপিতেছে। মৎস্যকে যেমন জলের ভার বহন করিতে হয়, তদ্রূপ আমাদিগকে বায়ুর ভার বহন করিতে হইতেছে। বায়ু-মণ্ডলের ঊর্দ্ধসীমা ঠিক নিরূপণ করিতে পারা যায় না। যতই হউক, উহা ৫০ মাইলের ন্যূন নহে। পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় যে, বায়ু প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চ পরিমিত স্থানে প্রায় সাত সের দুই ছটাক ভার দ্বারা চাপিতেছে। যে যন্ত্রদ্বারা বায়ুর চাপ নিরূপিত হয়, তাহাকে বায়ুমান-যন্ত্র[1] কহে। ঐ চাপ বায়ুমান-যন্ত্রের নলে সচরাচর ৩০ ইঞ্চ ঊর্দ্ধে পারদ তুলিয়া রাখিতে পারে। বায়ুর চাপ ঐ যন্ত্রের পারদস্তম্ভের উচ্চতা দ্বারা সূচিত হইয়া থাকে; যথা,—গত ১০ই বৈশাখ কলিকাতায় বেলা ১০টার সময়ের বায়ুচাপ ২৯.৮৯৫ ইঞ্চ, ঐ দিবস বেলা ৪টার সময়ের বায়ুচাপ ২৯.৭৪৮ ইঞ্চ ইত্যাদি। বায়ুর উষ্ণতা, দিনে দিনে, মাসে মাসে, যত অধিক পরিবর্ত্তন হয়, বায়ুর চাপের তত পরিবর্ত্তন হয় না। বায়ুর চাপের হ্রাস ও বৃদ্ধি সচরাচর এক ইঞ্চের মধ্যে ঘটিয়া থাকে। বায়ুমানযন্ত্রের নলে কিরূপে পারদ থাকে, তাহা উপরের চিত্রদ্বারা বুঝা যাইবে।

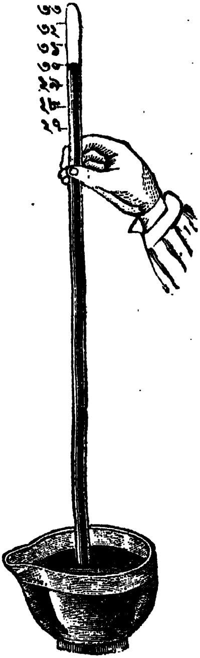

৫ চিত্র। বায়ুমান-যন্ত্র।

কোন দিবসের কোন স্থানের ২৪ ঘণ্টার বায়ুচাপ একত্র করিয়া ২৪ দিয়া ভাগ দিলে ঐ স্থানের ঐ দিবসের গড় বায়ুচাপ পাওয়া যায়। কোন বৎসরের কোন মাসের প্রত্যেক দিনের বায়ুচাপ একত্র করিয়া

---

[1] সরল পদার্থ-বিজ্ঞানের ৪০ প্রকরণ।

ঐ মাসের দিবস-সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে ঐ স্থানের ঐ মাসের গড় বায়ুচাপ নিরূপিত হয়। এইরূপে অনেক বৎসরের কোন মাসের বায়ুচাপ যোগ করিয়া বৎসরের সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে ঐ স্থানের ঐ মাসের গড় বায়ুচাপ পাওয়া যায়। যথা, ঢাকায় মে মাসের গড় বায়ুচাপ ২৯.৭৬০ ইঞ্চ, জানুয়ারী মাসের ৩০.০৮৫ ইঞ্চ, কলিকাতায় মে মাসের ২৯.৭৫৭ ইঞ্চ, জানুয়ারী মাসের ৩০.১১৯ ইঞ্চ ইত্যাদি। বায়ুচাপের ন্যূনাধিক্যবশতঃ বাতাস ও ঝড় উৎপন্ন হইয়া থাকে। এজন্য বায়ুচাপ নিরূপণ করা নিতান্ত প্রয়োজন হয়।

১৭। বায়ু-চাপের হ্রাসবৃদ্ধির কারণ। বায়ুর উষ্ণতার ন্যায় বায়ুর চাপের সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন হইতেছে। কোন্ কোন্ কারণে বায়ুর চাপের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিতে পারে, তাহা অনুসন্ধান করা যাউক।

(১) বায়ুচাপের হ্রাসবৃদ্ধির প্রধান কারণ, উহার উষ্ণতার পরিবর্ত্তন। বায়ুর উষ্ণতার বিচারকালে উক্ত হইয়াছে যে, যে স্থানে যত লম্বভাবে সূর্য্যকিরণ পতিত হয়, সে স্থান তত বেশী উত্তপ্ত হয়। সুতরাং সেই স্থানের বায়ুও উষ্ণ সুতরাং লঘু এবং ঊর্দ্ধগামী হয়। লঘু ও ঊর্দ্ধগামী বায়ুর ভার ও চাপ, শীতল বায়ুর ভার ও চাপ অপেক্ষা কম। এজন্য দুইটি পরস্পর দূরবর্ত্তী সমান ভূভাগ সূর্য্যের অবস্থানভেদে অসমানভাবে উষ্ণ হইয়া থাকে; তজ্জন্য ঐ ঐ স্থানের বায়ুর চাপেরও ন্যূনাধিক্য ঘটে। এতদ্ভিন্ন, বিভিন্ন স্থানের উষ্ণতার পার্থক্য ঘটিবার অপর একটি কারণ আছে।

(২) যদি দুইটি জলভাগ ও স্থলভাগ একই ভাবে সূর্য্যের তাপ প্রাপ্ত হয়, জল অপেক্ষা স্থলভাগ শীঘ্র উষ্ণ হইয়া উঠে। অর্থাৎ যে সময়ের মধ্যে জল এক তাপাংশ উষ্ণ হয়, সেই সময়ের মধ্যে স্থলভাগ প্রায় ৪। ৫ গুণ বেশী উষ্ণ হয়। যে কারণে[১] এক সের জল অপেক্ষা এক সের ঘৃত শীঘ্র

---

[১] সরল পদার্থ-বিজ্ঞানের ৮৮ প্রকরণ আপেক্ষিক তাপ দেখ।

উষ্ণ হয়, সেইরূপ কারণেই জলভাগ অপেক্ষা স্থলভাগ শীঘ্র উত্তপ্ত হয়। জল উষ্ণ হইতে বিলম্ব হইবার আর একটি কারণ দেখা যায়। জলে তাপ প্রয়োগ করিলে উহা হইতে প্রচুর বাষ্প বহির্গত হয়,তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। ঐ প্রযুক্ত তাপের কিয়দংশ জলকে বাষ্প করিতে ব্যয় হয়। এইরূপ, জলে সূর্য্যের তাপ পতিত হইলে তাহার কিয়দংশ বাষ্প উৎপাদন করিতে আবশ্যক হয়। এজন্য, একেইত জল উষ্ণ হইতে বেশী সময় লাগে, তাহার উপর আবার সমুদয় পতিত সূর্য্যের কিরণের কিয়দংশ জলকে বাষ্পীভূত করিতে ব্যয়িত হয়। এই সকল কারণে জল ও স্থল ভাগের উষ্ণতার বৈষম্য সর্ব্বদা ঘটিতেছে। এইরূপে দেখা যায় যে, যখন স্থলভাগের উপরিস্থ বায়ু ১০০°ফা উষ্ণ হয়, তখন সমুদ্র-জলের উপরের বায়ু কদাচিত ৮০°ফা হয়। কিন্তু তাপ-বিকিরণ সম্বন্ধে জল ও স্থল ঠিক বিপরীত। জল অপেক্ষা স্থল যেমন শীঘ্র উষ্ণ হয়, তেমনই উহা শীঘ্র শীতল হয়। রাত্রিতে তাপ-বিকিরণবশতঃ স্থলভাগের উপরের বায়ু জলের উপরের বায়ু অপেক্ষা ১০।১৫° শীতল হয়। সুতরাং জল ও স্থল ভাগের উপরিস্থিত বায়ুর উষ্ণতার এবং চাপের ন্যূনাধিক্য সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে।

(৩) বায়ুচাপের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিবার তৃতীয় কারণ, বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণের ন্যূনাধিক্য। পর অনুচ্ছেদে বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্পের পরিমাণের ইতরবিশেষ বিস্তারিতভাবে দেখা যাইবে। একই উষ্ণতার ও একই চাপের বায়ু ও জলীয় বাষ্পের ভার এক নহে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, কোনও বায়ুর ভার ৮ সের হইলে তাহার সমানায়তনবিশিষ্ট জলীয় বাষ্পের ভার ৫ সের মাত্র হয়, অর্থাৎ শুষ্ক বায়ু অপেক্ষা জলীয় বাষ্প বিস্তর হাল্‌কা। এজন্য কোনও বায়ুতে অধিক পরিমাণে জলীয় বাষ্প মিশ্রিত থাকিলে, ঐ বাষ্পমিশ্রিত

বায়ু শুষ্ক বায়ু অপেক্ষা লঘু হয়। এজন্য শুষ্ক বায়ু ও জলীয় বাষ্পমিশ্রিত বায়ু, এতদুভয়ের মধ্যে ভারের ন্যূনাধিক্য থাকাতে চাপের ন্যূনাধিক্য ঘটে।

১৮। সংক্ষিপ্তসার। আমরা বায়ুমণ্ডলের উপকরণ আলোচনা করিতে দেখিয়াছি যে, বায়ু প্রধানতঃ অম্লজনক ও যবক্ষারজনক নামক গ্যাসদ্বয়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে। উহাতে জলীয় বাষ্প, অঙ্গারকাম্ল নামক অপর একটি গ্যাস,ধূলিকণিকা, কীটাণু প্রভৃতি সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে। সূর্য্যের কিরণ বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া আসাতে উহার কিয়দংশ বায়ুদ্বারা শোষিত হয়। পরে পৃথিবীতে পতিত ও তদ্দ্বারা শোষিত তাপও বায়ুদ্বারা কিঞ্চিৎ পরিমাণে শোষিত হইয়া বায়ু উত্তপ্ত হইয়া থাকে। প্রতিঘণ্টা, প্রতিদিন, প্রতিমাসে বায়ুর উষ্ণতার পরিবর্ত্তন হইতেছে। পরে উহার চাপের বিষয় আলোচনা করা গিয়াছে। বায়ুমণ্ডলের ঊর্দ্ধসীমা কত, তাহা নিশ্চয়রূপে অবধারণ করা অসম্ভব। উহা যতই হউক, বায়ুর চাপ প্রয়োগ করিবার ধর্ম্ম এবং ভার থাকায়, উহা যাবতীয় সামগ্রীকে চাপিতেছে। ঐ চাপ বায়ুমান-যন্ত্র দ্বারা নিরূপিত হইয়া ইঞ্চ ও ইঞ্চের দশমিকাংশ দ্বারা ব্যক্ত হয়। বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার তারতম্যহেতু উহার চাপ সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ঐ পরিবর্ত্তনের ফলস্বরূপ বাতাসের উৎপত্তি হয়।

২ § বায়ুর জলীয় বাষ্প।

১৯। জলীয় বাষ্প। পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে বলা গিয়াছে যে, সকল সময়েই বায়ুতে অল্পাধিক জলীয় বাষ্প বর্ত্তমান আছে। জলীয় বাষ্প বায়ুর ন্যায় অদৃশ্য পদার্থ। কিন্তু শৈত্য প্রয়োগে উহা জমাইয়া জলের আকারে পরিণত করিতে পারা যায়। বাটীতে উষ্ণ দুগ্ধ বা

জল রাখিয়া থালা চাপা দিলে, দুগ্ধ ও জল হইতে উত্থিত উষ্ণ জলীয় বাষ্প শীতল থালের সংস্পর্শে আসিয়া, জমিয়া জল হয়।

এক্ষণে দেখা যাউক, বায়ুর কোন্ কোন্ অবস্থায় জল হইতে বাষ্প প্রবলবেগে উত্থিত হইতে পারে। আর্দ্র বস্ত্র শীঘ্র শুষ্ক করিতে হইলে, তাহাকে মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে রাখিতে হয়। প্রাতঃকালের কিম্বা সন্ধ্যাকালের রৌদ্রে রাখিলে তাহাকে শুষ্ক করিতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগে। রাত্রিকালে আরও অধিক সময় আবশ্যক হয়। এই সমুদায় ঘটনা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, বায়ু যত বেশী উষ্ণ হয়, তত শীঘ্র জল বাষ্পাকার ধারণ করে। এই নিমিত্ত শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে বাষ্প অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং শীতকালের বায়ু অপেক্ষা গ্রীষ্মকালের বায়ুতে অধিক পরিমাণে বাষ্প থাকে। কলিকাতায় দেখা গিয়াছে যে, শীতকালের বায়ু অপেক্ষা গ্রীষ্মকালের বায়ুতে প্রায় দ্বিগুণ পরিমিত জলীয় বাষ্প বর্ত্তমান থাকে।

কিন্তু শীতকালের বায়ুতে পরিমাণে কম জলীয় বাষ্প থাকিলেও শীতকালের রাত্রির ও প্রত্যূষের বায়ুকে ভিজা বাতাস বলিয়া থাকি। তখন রাত্রিকালে ঘরের জানালা, কবাট কিঞ্চিৎমাত্র খোলা থাকিলে, বোধ হয়, যেন হিমবর্ষণ হইতেছে। অথচ গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে ঠাণ্ডা পড়িলেও তখনকার বায়ু ভিজা বোধ হয় না। এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, শীতকালের বায়ুতে অল্প পরিমাণে জলীয় বাষ্প থাকিলেও তাহাতে যতখানি জলীয় বাষ্প থাকিতে পারে,তাহাতে প্রায় ততখানি থাকে এবং গ্রীষ্মকালের উষ্ণ বায়ুতে অপেক্ষাকৃত অধিক জলীয় বাষ্প থাকিলেও তাহাতে যতখানি থাকিতে পারে, ততখানি থাকে না।

কোন উষ্ণতার কোন বায়ুতে যতখানি জলীয় বাষ্প বাষ্পাকারে থাকিতে পারে, তাহাতে ততখানি থাকিলে, সেই বায়ু পূর্ণসিক্ত হয়।

কোন বায়ুতে যতখানি আছে, তাহাতে যদি আর ততখানি থাকিতে পারে, তাহাকে $\frac{১}{২}$ সিক্ত বলা যায়, তাহার তৃতীয়াংশ তাহাতে থাকিতে পারিলে ঐ বায়ুকে $\frac{১}{৩}$ সিক্ত বলা যায় ইত্যাদি। অতএব আমরা বায়ুর সিক্ততা $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৩}$ ইত্যাদি দ্বারা অনায়াসে প্রকাশ করিতে পারি। বায়ুর পূর্ণসিক্ত অবস্থাকে এক না ধরিয়া একশত ধরিলে, সিক্ততা প্রকাশ করিবার জন্য ভগ্নাংশ-সংখ্যার প্রয়োজন হয় না। এজন্য সচরাচর একশতের ভাগ দ্বারা বায়ুর সিক্ততা সূচিত হইয়া থাকে। যথা, কলিকাতায় বৈশাখজ্যৈষ্ঠ মাসের গড় সিক্ততা ৭৬, কটকে ঐ দুই মাসের গড় সিক্ততা ৬৭ ইত্যাদি। দৈনিক, মাসিক ও বাৎসরিক গড় সিক্ততা, গড় উষ্ণতার ও চাপের ন্যায়, নিরূপিত হয়।

বর্ষাকালের বায়ু প্রায় পূর্ণসিক্ত থাকে। এজন্য আমরা দেখিতে পাই, তখন আর্দ্র বস্ত্র শুকাইতে বিস্তর সময় লাগে। ঐ সময়ে বায়ুতে প্রায় পূর্ণমাত্রায় জলীয় বাষ্প থাকাতে আর্দ্র বস্ত্রের জলীয় ভাগ হইতে শীঘ্র শীঘ্র বাষ্প উঠিতে পারে না। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, বায়ুর সিক্ততা পূর্ণসিক্ততার অবস্থা হইতে যত কম হইবে, অর্থাৎ বায়ু যত শুষ্ক হইবে, তত প্রবল বেগে জল হইতে বাষ্প উত্থিত হইতে থাকিবে। শীতকালে একটি ঘরে ৫। ৬ খানি আর্দ্র বস্ত্র শুকাইতে দিয়া ঘর বন্ধ রাখিলে, সেই সকল বস্ত্র শুকাইতে বিস্তর বিলম্ব হয়। ইহার কারণ এই যে, ঘরের বায়ু বস্ত্রের জলের বাষ্পে শীঘ্র প্রায় পূর্ণসিক্ত হইয়া উঠে। এজন্য তখন সেই সিক্ত বায়ু আর বড় বেশী বাষ্প গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু সেই সিক্ত বায়ু যদি সরাইয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত শুষ্ক বায়ু তথায় আনা যায়, অর্থাৎ যদি বস্ত্রের চারিদিকে বাতাস বহে, তাহা হইলে ঐ বাতাস বস্ত্রের জলের বাষ্প কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাইবে এবং অবিলম্বে বস্ত্রগুলি শুষ্ক

হইবে। এই ঘটনাটি দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, বাতাস থাকিলে বাষ্পীকরণ প্রবল হয়।

আমরা উপরে দেখিলাম যে, (১) বায়ুর উষ্ণতার আধিক্য, (২) পূর্ণসিক্ততা হইতে অন্তর এবং (৩) বাতাস, এই তিনটি থাকিলে জলীয় বাষ্প প্রচুর পরিমাণে উদ্ভূত হয়। ঐ তিনটির কোন একটি কম হইলেই বায়ু শীঘ্র পূর্ণসিক্ত হইয়া উঠে।

২০। **বায়ুর সিক্ততার ঘণ্টায় ঘণ্টায় হ্রাসবৃদ্ধি।** পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বায়ুর উষ্ণতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার জলীয় বাষ্প ধারণ করিবার ক্ষমতার বৃদ্ধি হয়। এজন্য সমস্ত দিবসের মধ্যে বায়ুর সিক্ততার অবস্থা পরিবর্ত্তন হইতেছে। বেলা ১—৩ টার সময় সিক্ততা খুব কম হইয়া অল্পে অল্পে বাড়িতে থাকে। অবশেষে প্রত্যুষের পূর্ব্বে কয়েক ঘণ্টায় বায়ুর সিক্ততা খুব বৃদ্ধি হইয়া সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার বাড়িতে থাকে। এজন্য রাত্রি ২॥ প্রহর হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত অনাবৃত স্থানে শয়ন করিলে, সর্দ্দি, গাত্রবেদনা প্রভৃতি হইয়া থাকে।

২১। **শিশির।** পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থের তাপ বিকিরণদ্বারা নষ্ট হইতেছে। কোন দ্রব্যের উষ্ণতা চতুর্দ্দিকবর্ত্তী বায়ু অপেক্ষা কম হইয়া পড়িলে এবং ঐ সকল শীতল দ্রব্যের সংস্পর্শে সিক্ত অথচ উষ্ণ বায়ু আসিলে, বায়ুর উষ্ণতা কমিয়া গিয়া উহা প্রথমতঃ জলীয় বাষ্পদ্বারা পূর্ণসিক্ত এবং অবশেষে হয়তঃ তদপেক্ষাও বেশী সিক্ত হয়। তখন বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্প তৎসমুদয় দ্রব্যে জমিয়া গিয়া শিশির-বিন্দুরূপে দৃষ্ট হয়। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, যে সমস্ত দ্রব্যের তাপ বিকিরণদ্বারা প্রচুর পরিমাণে নষ্ট হয়, তৎ সমুদয় দ্রব্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে শিশির সঞ্চিত হইবে।

অনেকে মনে করেন যে, বৃষ্টির স্থায় শিশির আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হয়। বৃষ্টির কারণ মেঘ, আকাশে থাকে, সুতরাং বৃষ্টি আকাশ হইতে পতিত হয়। কিন্তু শিশিরের কারণ বায়ুমণ্ডলের নিম্ন স্তরের জলীয় বাষ্প, সুতরাং উহা উপর হইতে পতিত না হইয়া, দ্রব্যাদিতে জমিয়া উৎপন্ন হয়।

২২। কোন্ কোন্ অবস্থায় শিশির বেশী সঞ্চিত হয়। দ্রব্যাদির ও বায়ুর কোন্ অবস্থায় শিশির বেশী সঞ্চিত হয়, তাহা অনায়াসে জানা যাইতে পারে।

(১) চাঁদোয়া টাঙ্গাইলে, তাহার নীচের ভূমির তাপ ঊর্দ্ধে গিয়া নষ্ট হইতে পায় না। যাহা উঠে, তাহা চাঁদোয়া দ্বারা প্রতিহত হইয়া পুনর্ব্বার ভূমিতেই আইসে। এজন্য দেখা যায় যে, তাহার নীচের বায়ুর উষ্ণতা কম হইয়া পূর্ণসিক্ত হয় না এবং তথাকার দ্রব্যাদিতে শিশিরও সঞ্চিত হয় না। ঐ কারণবশতঃ রাত্রি মেঘাচ্ছন্ন হইলে, মেঘসমূহ পূর্ব্বোক্ত চাঁদোয়ার স্থায় তাপ-বিকিরণের ব্যাঘাত জন্মায় এবং মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে বায়ু অপেক্ষাকৃত গরম বোধ হয়। এজন্য দ্রব্যাদিতে শিশির-সঞ্চারের অভাব দেখা যায়। বৃক্ষতলে কিম্বা বাড়ীর নিকটবর্ত্তী দ্রব্যাদিতেও ঐ নিমিত্ত শিশির খুব কম সঞ্চিত হয়। অতএব আমরা জানিতে পারিলাম যে, অন্তরীক্ষে তাপ-বিকিরণের কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে শিশিরের সঞ্চার বেশী হয়।

(২) পূর্ব্বে (১৯ প্রক) বলিয়াছি যে, বাতাস থাকিলে জলীয় বাষ্পদ্বারা বায়ুকে পূর্ণসিক্ত করা বড় কঠিন হয়। তজ্জন্য যে রাত্রিতে খুব বাতাস বহিতে থাকে, সেই রাত্রিতে দ্রব্যাদি ও ভূ-পৃষ্ঠের বায়ু যথেষ্ট শীতল হইতে পায় না এবং শিশিরও সঞ্চিত হয় না। অতএব অপেক্ষাকৃত কম বাতাস থাকিলে শিশির-সঞ্চার বেশী হয়।

(৩) যখন বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্পই শৈত্যপ্রযুক্ত জমিয়া শিশির-রূপ ধারণ করে, তাহাতে সহজেই বুঝা যায় যে, বায়ু খুব সিক্ত থাকিলে সহজেই শিশির বেশী সঞ্চিত হয়।

(৪) সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে তাপ বিকিরণ করে না। সুতরাং একই অবস্থায় বিভিন্ন দ্রব্য থাকিলেও যে সকল হইতে তাপ অধিক বিকীর্ণ হইবে, সেই সকল পদার্থে অধিক পরিমাণে শিশির জমিবে। কম্বল, চুল, কাচ, ঘাস, শিলা, ইহারা তাপের সুবিকিরক এবং তাপের অপরিচালক; তজ্জন্য শিশির ঐ সকল দ্রব্যে বেশী সঞ্চিত হয়। কাংস্যপিত্তলাদি চিক্কণ ধাতুদ্রব্য হইতে তাপ বিকিরণদ্বারা শীঘ্র নষ্ট হয় না, বরং অন্যপক্ষে তাহারা তাপ-পরিচালক হওয়াতে অন্যান্য দ্রব্য হইতে তাপ গ্রহণ করিয়া থাকে। এজন্য ঐ সমুদায় দ্রব্যে শিশির সঞ্চিত হয় না।

২৩। **কুজ্ঝটিকা।** পুনঃ পুনঃ বলা গিয়াছে যে, জলীয় বাষ্প বায়ুর ন্যায় অদৃশ্য এবং স্বচ্ছ পদার্থ। যে উষ্ণতায় বায়ু জলীয় বাষ্পে পূর্ণসিক্ত হয়, সেই উষ্ণতা অপেক্ষা উহা অধিক শীতল হইলে কিয়দংশ জলীয় বাষ্প জমিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণায় পরিণত হয়। এই সকল জলকণিকা নিতান্ত সূক্ষ্ম হওয়াতে বায়ুতে ধূলিকণার ন্যায় ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়ায়। তখন বায়ু আর স্বচ্ছ দেখা যায় না। ঐ সকল জলকণা ভূ-পৃষ্ঠের নিকটস্থ বায়ুতে উৎপন্ন হইলে, কুজ্ঝটিকা বা কুয়াসা নামে অভিহিত হয়, এবং অনেক ঊর্দ্ধে হইলে মেঘ নামে ব্যক্ত হয়। যখন হাঁড়ির জল ফুটিতে থাকে, তাহার অপেক্ষাকৃত শীতল গলদেশের সংস্পর্শে অদৃশ্য বাষ্প জমিয়া শাদা কুয়াসার ন্যায় দেখায়। বস্তুতঃ বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্প শৈত্যে জমিয়া এইরূপে মেঘ এবং কুয়াসা উৎপন্ন হয়।

২৪। মেঘ ও বৃষ্টি। অতএব নিম্ন ও উচ্চ অবস্থানভেদ ব্যতীত কুয়াসায় ও মেঘে কোনরূপ বৈসাদৃশ্য নাই। উভয়েই অতীব সূক্ষ্ম জলকণিকার সমষ্টি। আমরা দেখিলাম যে, বায়ুর কিয়দংশ জলীয় বাষ্প জমিয়া গিয়া মেঘ এবং কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করে। সাধারণতঃ ঐ ক্রিয়া অতীব ধীরে ধীরে সম্পন্ন হয়, এজন্য মেঘ হইলেই বৃষ্টি হয় না। যদি জলীয় বাষ্প বেগে হঠাৎ জমিয়া যায়, তবে মেঘের অতীব সূক্ষ্ম কণাসকল একত্র হইয়া বড় বড় ফোঁটা হয়। বড় হওয়াতে তাহাদিগের ভার বৃদ্ধি হয়, সুতরাং তখন তাহারা বৃষ্টিরূপে ভূতলে পতিত হয়।

কি কি কারণে জলীয় বাষ্প জমিয়া প্রথমতঃ মেঘের এবং পরে বৃষ্টির উৎপত্তি করিতে পারে তাহার কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) জলীয় বাষ্প বায়ু অপেক্ষা $\frac{৫}{৮}$ গুণ হাল্কা, সুতরাং উহা উৎপন্ন হইবামাত্র ঊর্দ্ধে বায়ুর উপর উঠিতে ও চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। কিয়দ্দূর ঊর্দ্ধে উঠিয়া উহা শীতলতর বায়ুর সংস্পর্শে আসিলে বাষ্পাকার পরিত্যাগ করিয়া অতীব সূক্ষ্ম জলকণায় পরিণত হয়। এইরূপ কোন কারণে কোন আর্দ্র বায়ু শীতল হইলেই মেঘের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

(২) কোন উষ্ণ ও আর্দ্র বাতাস অপর কোন শীতল ও আর্দ্র বাতাসের সহিত মিশ্রিত হইলে, উভয়ের উষ্ণতা কমিয়া গিয়া মেঘ এবং পরে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়। কিন্তু এইরূপে বৃষ্টি হইতে পারে, এমন উষ্ণতার হ্রাস বড় সহসা হয় না।

(৩) যদি কোন সিক্ত বাতাসের পথে কোন উচ্চ পাহাড় পড়ে, তাহা হইলে উহার উষ্ণতা অত্যন্ত বেগে কমিয়া যায় এবং মেঘ ও বৃষ্টি উৎপন্ন হয়।

২৫। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ। কোন স্থানে কোন্ মাসে কোন্ বৎসরে কত বৃষ্টি হয়, তাহার পরিমাণ করা বড় আবশ্যক। যেহেতু

পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি হইলে সুচারুরূপে শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যাদি জীবজন্তুর প্রাণ ধারণের উপায় হয়। এদেশে কোন্ স্থানে কি পরিমাণে বৃষ্টি হয়, তাহা নিরূপণ জন্য গবর্ণমেণ্ট লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা স্ব স্ব স্থানের বৃষ্টির পরিমাণ, বায়ুর উষ্ণতা, চাপ, সিক্ততা প্রভৃতি বায়ুর সমস্ত বিবরণ কলিকাতার প্রধান কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দেন। এই কার্য্যালয়কে বায়ুবিদ্যা-বিভাগের কার্য্যালয় বলে।

যেমন বায়ুর উষ্ণতা-মাপক তাপমান-যন্ত্র, চাপ-মাপক বায়ুমান-যন্ত্র আছে, তেমনই বায়ুর সিক্ততা-মাপক সিক্ততামান এবং বৃষ্টি মাপিবার বৃষ্টিমান-যন্ত্র আছে। অতিসামান্য উপায়ে বৃষ্টিপাত পরিমাণ করিতে পারা যায়। মনে কর, তুমি কোন খোলা স্থানে একটি বর্ত্তুলাকৃতি গেলাস বসাইয়া রাখিলে। পরে এক দিবস বৃষ্টি হওয়াতে, মনে কর, তোমার গেলাসে ১ ইঞ্চ গভীর জল হইল। ইহাতে জানা গেল যে, যদি সেই স্থানের সমুদায় খাল বিল পূরাইয়া এবং সমস্ত উচ্চ জায়গা ভাঙ্গিয়া দিয়া স্থানটি সমভূমি করা যাইত, তাহা হইলে সেই দিবসের বৃষ্টিতে উক্ত স্থানটি ১ ইঞ্চ জলে প্লাবিত হইত। এইরূপে বিভিন্ন স্থানের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নিরূপিত হইয়া বলা যায় যে, অমুক স্থানে ঐ দিবসে বা ঐ মাসে বা ঐ বৎসরে এত ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছে। যথা, কলিকাতার বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৬৩.৭ ইঞ্চ, ভাগলপুরের ৪৫.৭ ইঞ্চ, ময়মনসিংহের ৯৩.৫ ইঞ্চ ইত্যাদি। এখানে বৃষ্টিপাতজ্ঞাপক ভারতের একখানি মানচিত্র এবং পরিশিষ্টে ভারতের কয়েকটি স্থানের গড় বৃষ্টিপাতের তালিকা প্রদত্ত হইল। ভারতের বিভিন্ন স্থানে বৎসরে কত ইঞ্চ বৃষ্টি হয়, উহা হইতে তাহা মোটামুটি অনায়াসে জানা যাইবে।

২৬। কোন্ কোন্ স্থানে বৃষ্টিপাত বেশী হয়।

খাসিয়া-পাহাড়ের চিরাপুঞ্জি নামক স্থানে পৃথিবীর সর্ব্বস্থান অপেক্ষা

অধিক বৃষ্টি হয়। উহার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৪৭৪ ইঞ্চ অর্থাৎ ৩৯॥ ফুট বা ২৬ হাত। তবেই দেখ, এক বৎসরের বৃষ্টি সেস্থানে জমা হইয়া থাকিলে, বড় বড় তাল গাছ ঐ জলরাশিতে নিমগ্ন হইত। খাসিয়া-পাহাড় শ্রীহট্টের বিল হইতে প্রায় ঋজুভাবে ৪,০০০ ফুট বা কিছু কম ১ মাইল উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। দক্ষিণপশ্চিমের মৌসুমী বাতাস বঙ্গসাগর হইতে প্রভূত জলীয় বাষ্প লইয়া আসাম অভিমুখে প্রবাহিত হইবার সময় খাসিয়া-পাহাড় তাহার গতি অবরোধ করে; তখন ঐ বাতাস উহার গাত্র দিয়া উঠিতে বাধ্য হওয়াতে অত্যন্ত শীতল হয় এবং ঐ বাতাসের অধিকাংশ জলীয় বাষ্প বৃষ্টিরূপে খাসিয়া-পাহাড়ের দক্ষিণ পার্শ্বে পতিত হয়।

খাসিয়া-পাহাড়ের পর, সহ্যাদ্রি-পর্ব্বতমালা ও আরাকাণ-প্রদেশ অতিবৃষ্টির জন্য ভারতে বিখ্যাত। দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম পার্শ্বস্থ সমস্ত প্রদেশ আরবসাগর হইতে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে প্রবহমান বাতাস হইতে বৃষ্টি প্রাপ্ত হয়। সহ্যাদ্রির পশ্চিম পার্শ্বে এজন্য বেশী বৃষ্টি হয় এবং তাহাতে জলীয় বাষ্প অনেক কম হওয়াতে ঐ পর্ব্বতের পূর্ব্ব পার্শ্বে অনেক অল্প পরিমাণে বৃষ্টি পতিত হয়। সহ্যাদ্রির পশ্চিমে বোম্বাই নগরের বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৮২ ইঞ্চ। ৪,৫০০ ফুট উচ্চে মহাবালেশ্বর পাহাড়ের ২৬১ ইঞ্চ, কিন্তু সহ্যাদ্রির পূর্ব্ব পার্শ্বে পুনা নগরের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত কেবল ২৮ ইঞ্চ মাত্র (৫ চিত্র)।

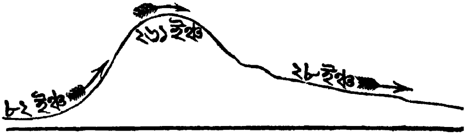

৫ চিত্র।

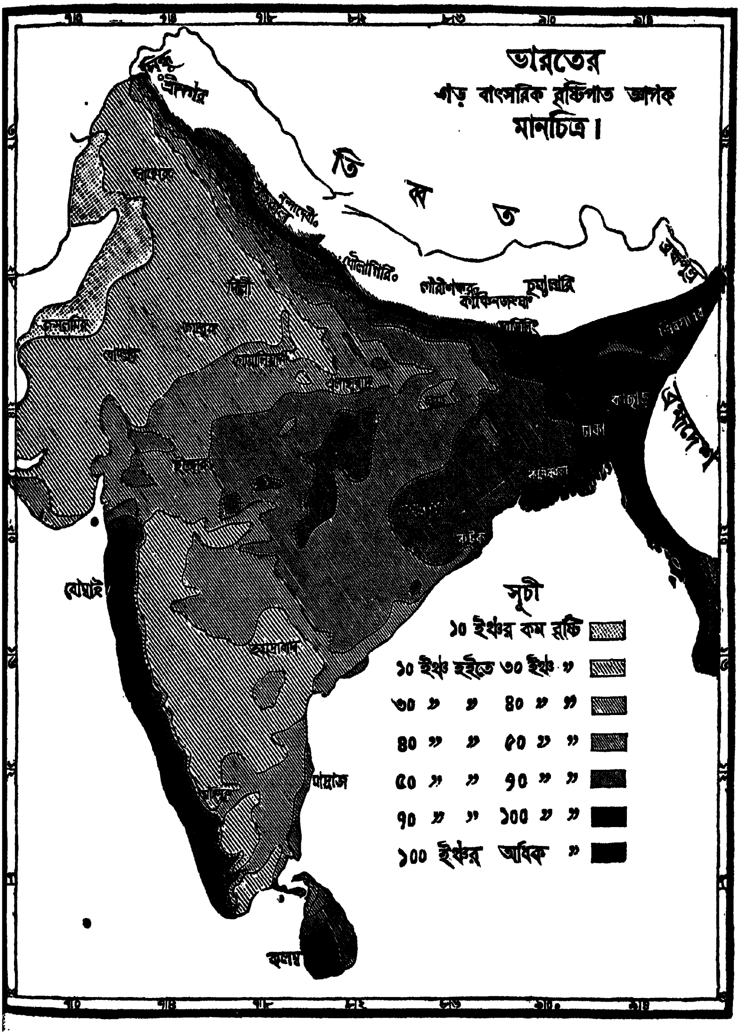

ভারতের
গড় বাৎসরিক বৃষ্টিপাত জ্ঞাপক
মানচিত্র।

তিব্বত
শ্রীনগর
নন্দাদেবী
ধৌলাগিরি
গৌরীশঙ্কর
কাঞ্চনজঙ্ঘা
চুমলহারি
দার্জিলিং
ব্রহ্মপুত্র
শিবসাগর
দিল্লী
জয়পুর
যোধপুর
এলাহাবাদ
কাছাড়
ঢাকা
ব্রহ্মদেশ
কলিকাতা
ইন্দোর
কটক
বোম্বাই
হায়দরাবাদ
মাদ্রাজ
কলম্বো
সূচী
১০ ইঞ্চর কম বৃষ্টি ▨
১০ ইঞ্চ হইতে ৩০ ইঞ্চ ,, ▨
৩০ ,, ,, ৪০ ,, ,, ▨
৪০ ,, ,, ৬০ ,, ,, ▨
৬০ ,, ,, ৭০ ,, ,, ▨
৭০ ,, ,, ১০০ ,, ,, ■
১০০ ইঞ্চর অধিক ,, ■
৬৬
৭০
৭৪
৭৮
৮২
৮৬
৯০
৯৪

(২) পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী স্থানসকলে কিরূপে বৃষ্টিপাত বেশী হয়, তাহা উপরে দেখা গেল। এতদ্ভিন্ন, সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানসকলেও বৃষ্টি অধিক পতিত হয়। কলিকাতা, নোয়াখালি, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে কোন পর্ব্বত নাই, অথচ ঐ সমুদয় বঙ্গসাগরের নিকটবর্ত্তী হওয়াতে বর্দ্ধমান, পাটনা, বহরমপুর প্রভৃতি স্থানসকল অপেক্ষা ঐ সকল স্থানে অধিক বৃষ্টি হয়।

(৩) কিন্তু পর্ব্বতই নিকটে থাকুক আর সমুদ্রই নিকটে থাকুক, সমুদ্র হইতে কোন স্থানে বাতাস না বহিলে, সেই স্থানে বৃষ্টি বেশী হইবার কম সম্ভাবনা। কলিকাতা, চিরাপুঞ্জি, বোম্বাই, নোয়াখালি স্থানে প্রচুর বৃষ্টি হইবার একটি প্রধান কারণ এই যে, ঐ ঐ স্থানে সমুদ্র হইতে বাতাস বহিয়া থাকে। দেখ, পুরী সমুদ্রের উপকূলে, অথচ তথায় সমুদ্রাগত বায়ুপ্রবাহ বেশী না থাকাতে বৃষ্টিপাত কলিকাতার অপেক্ষাও কম হয়। আরও দেখ, বঙ্গদেশে শীতকালে যখন উত্তরে বাতাস বহিয়া থাকে, তখন আমরা প্রায়ই বৃষ্টি পাই না।

২৭। **বর্ষাকাল।** আমাদের দেশে বৎসরে যত বৃষ্টি হয়, তাহার প্রায় ১০ ভাগের ৯ ভাগ জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষার্দ্ধ হইতে আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র এবং কখন কখন আশ্বিনের প্রথমার্দ্ধ, এই কয়েক মাসের মধ্যে পতিত হয়। বাকি ৮ মাসে খুব অল্প বৃষ্টি হয়। এজন্য এদেশে বর্ষা একটি ঋতুমধ্যে ধরা যায়। কিন্তু ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে বর্ষা বলিয়া এমন একটি ঋতু নাই; তথায় বৎসরের সকল সময়ই অল্পাধিক বৃষ্টি হয়।

বঙ্গদেশে অগ্রহায়ণের শেষার্দ্ধ ও পৌষের প্রথমার্দ্ধ, সম্বৎসর মধ্যে মেঘ ও বৃষ্টিশূন্য কাল বলিতে পারা যায়। বসন্তকালে বঙ্গদেশ অপেক্ষা কাছাড় ও আসামে বেশী বৃষ্টি হয়। কিন্তু উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বসন্তকাল একরকম বৃষ্টিশূন্য কাল। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের পশ্চিমে শীতকালে বৃষ্টি হয়, এজন্য তথাকার শীতকাল ও বর্ষাকাল এক বলা অস-

ঙ্গত নহে। আমাদের বঙ্গদেশে আষাঢ় হইতেই বর্ষার আরম্ভ। অনেক বৎসর ব্যাপিয়া পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জানা যায় যে, রাত্রি ৯।১০ টার সময় খুব কম মেঘ দেখা যায়, এবং রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে প্রায়ই বৃষ্টি হয় না। রাত্রি ১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত অধিকাংশ সময় বৃষ্টি হয়।

২৮। **নির্ব্বর্ষ দেশ।** সাহারা,গোবি প্রভৃতির মরুভূমি হইবার কারণ, বৃষ্টির অভাব। ভারতে এইরূপ একটি প্রকাণ্ড মরুভূমি আছে। উহার নাম থূর-মরুভূমি। পঞ্জাবের পশ্চিম, এই সিন্ধু এবং থূর-মরুভূমিতে বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যায়, বিন্দুমাত্রও বৃষ্টি পতিত হয় না। মিসর, আরব, পারস্য, পেরু ও কালিফর্ণিয়া, এই সকল দেশের কিয়দংশ একপ্রকার বৃষ্টিশূন্য দেশ।

২৯। **শিলা-বৃষ্টি।** শিলাবৃষ্টি হইতে সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ এই তিন মাসেই সচরাচর শিলা পতিত হইয়া থাকে। ভারতের সর্ব্বত্রই শিলাবৃষ্টি হয়। চৈত্র ও বৈশাখ মাসেই প্রধানতঃ বেশী শিলাবৃষ্টি হইতে দেখা যায়। পশ্চিমে ঝড় হইবার অগ্রে শিলা পতিত হইয়া থাকে। বৃষ্টি হইবার পর আর পড়ে না। ৮।১০ মিনিট কালমাত্র পতিত হয়। বেলা ৩। ৪ টার সময়ই অধিকাংশ শিলাবৃষ্টি হয়। রাত্রিতে প্রায় আদৌ হয় না। বৃষ্টিজল পতিত হইবার সময় অধিক শৈত্যে জমিয়া গিয়া শিলার আকার ধারণ করে।

৬ চিত্র। নীহারদানা।

৩০। **তুষার ও নীহার।** বৃষ্টি পতিত হইবার সময় প্রচুর শৈত্যে যেমন উহা শিলার আকার ধারণ করে, তদ্রূপ কোন স্থান

সমধিক শীতল হইলে জলীয় বাষ্প কুয়াসার জল না হইয়া জমিয়া তুষার এবং শিশির না হইয়া জমিয়া নীহার রূপে দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশ তুষার উৎপাদনপক্ষে যথেষ্ট শীতল হয়না। এজন্য উহা দেখিতে পাওয়া যায় না। হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে, হাজারিবাগ অঞ্চলে শীতকালে শিশিরজলের পরিবর্ত্তে নীহার সঞ্চিত হইতে দেখা যায়। তথায় চৌকি,পাথর প্রভৃতি সামগ্রী অনাবৃত স্থানে থাকিলে, তাহাদিগের উপর নীহার-দানা দেখিতে পাওয়া যায়। তুষার ও নীহার দানাস্বরূপ পতিত হয়। ঐ সমস্ত দানা দেখিতে পরম রমনীয়। এস্থলে নীহারদানার ও কয়েক প্রকার তুষারদানার প্রতিমূর্ত্তি দেখান গেল (৬, ৭ চিত্র)।

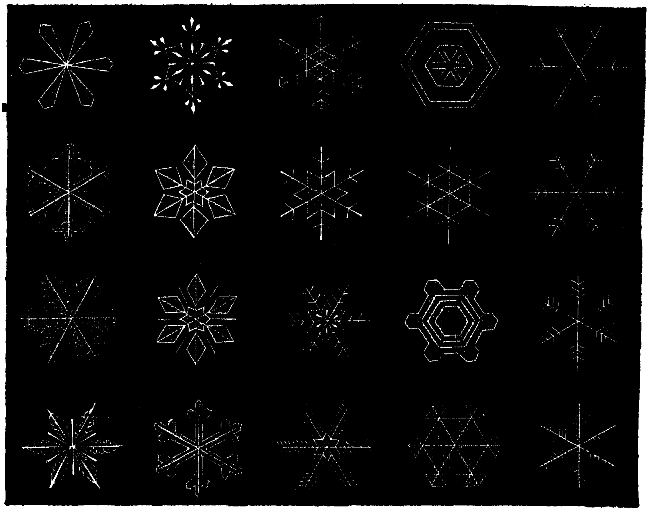

৭ চিত্র। তুষারদানা।

৩১। সংক্ষিপ্ত সার। এই অনুচ্ছেদে আমরা বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্পের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও পরিণাম আলোচনা করিলাম। সূর্য্যা-

তাপে জল ক্রমাগত বাষ্পীভূত হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইতেছে। উষ্ণতার হ্রাস হইলে ঐ বাষ্প জমিয়া আবার জলরূপ ধারণ করিতেছে। অবস্থান ও প্রকৃতি ভেদে জলীয় বাষ্প শিশির, কুয়াসা, মেঘ ও বৃষ্টিজল রূপে দেখা যায়। সমধিক শৈত্য হইলে শিশির, কুয়াসা ও বৃষ্টির জলের পরিবর্ত্তে নীহার, তুষার ও শিলারূপে দৃষ্ট হয়। তবেই দেখ, পৃথিবীস্থ যাবতীয় জলভাগ ও সরসপদার্থ হইতে বাষ্প উত্থিত হইয়া নানাপ্রকার রূপ গ্রহণপূর্ব্বক অবশেষে ভূ-পৃষ্ঠে আসিয়া পড়িতেছে। এইরূপে সমুদ্র প্রভৃতি নানা স্থানের জল বাষ্পাকারে বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িতেছে। বাষ্পীভূত না হইলে সমুদ্রের জল চিরকাল সমুদ্রে থাকিয়া যাইত, বৃষ্টিরূপে ভূ-পৃষ্ঠ সিক্ত না করিলে তরুশস্যাদির জন্ম অসম্ভব হইত এবং মনুষ্যাদি প্রাণিবর্গও নানা স্থানে বাস করিতে অক্ষম হইত। সূর্য্যোত্তাপই এই সমস্ত প্রাকৃতিক ব্যাপারের একমাত্র কারণ।

৩ § বাতাস।

৩২। **বাতাস।** বায়ু মুহূর্ত্তের নিমিত্তও নিশ্চল অবস্থায় দেখা যায় না। মৃদু মন্দ বায়ু হইতে প্রবল ঝটিকা প্রায়ই দেখা যায়। প্রবাহিত বায়ুকে বাতাস বলে।

কিরূপে বাতাস উৎপন্ন হয়, তাহা এক্ষণে দেখা যাউক। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, নানা কারণে বায়ুর উষ্ণতার ন্যায়, উহার চাপের সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন হইতেছে। একই সময়ে বিভিন্ন স্থানের বায়য়ু চাপ বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। মনে কর, দুইটি দূরবর্ত্তী স্থান একই সমতলে আছে। এক স্থানের উপরের বায়ু চাপ, মনে কর, অপর স্থানের বায়ুচাপের বেশী। এস্থলে, যেমন উচ্চস্থান হইতে জল প্রবাহিত হইয়া নিম্নস্থানে যাইয়া, উভয় স্থানের জলের উপরিভাগ এক সমতলে

থাকিতে চায়, তদ্রূপ বেশী চাপের বায়ু প্রবাহিত হইয়া কম চাপের বায়ুর দিকে আসিয়া উভয় স্থানের বায়ুচাপ এক হইতে চায়। এই রূপে, যতক্ষণ উভয় স্থানের বায়ুচাপ সমান না হইয়া উঠে, ততক্ষণ বেশী চাপের স্থান হইতে বাতাস কম চাপের স্থানের দিকে বহিতে থাকিবে। দুইটি স্থানের বায়ুর চাপের ন্যূনাধিক্যই বাতাসের উৎপত্তির মুখ্য কারণ। এই জন্যই বায়ুর চাপের পরিমাণ স্থির করা এত আবশ্যক। কোন কারণে বায়ুর চাপের বেশী ন্যূনাধিক্য ঘটিলে প্রবল ঝড় হইতে বাতাবর্ত্ত পর্য্যন্ত সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।

৩৩। **বাতাসের নাম।** যে দিক্ হইতে বাতাস বহে, সেই দিক্ অনুসারে সেই বাতাসের নাম হইয়া থাকে। শীতকালে আমাদিগের দেশে উত্তর দিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়, এজন্য উহাকে 'উত্তরে' বাতাস বলে। তদ্রূপ, 'পূর্ব্বে', 'পশ্চিমে' বাতাস বলা যায়।

৩৪। **সমুদ্র-বাতাস ও ভূ-বাতাস।** চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, পুরী প্রভৃতি সমুদ্রের উপকূলস্থ স্থানসকলে দেখা যায় যে, দিবাভাগে সমুদ্র হইতে ভূম্যভিমুখে এবং রাত্রিভাগে ভূমি হইতে সমুদ্রদিকে দিবারাত্রির মধ্যে দুইটি বিপরীত দিকের বাতাস বহিয়া থাকে। দিবসে সমুদ্র হইতে স্থলের দিকের বাতাসটিকে সমুদ্র-বাতাস ও রাত্রিকালের স্থলভাগ হইতে সমুদ্র দিকের বাতাসটিকে ভূ-বাতাস বলে।

এক্ষণে ঐ দুইটি বাতাসের উৎপত্তির বিষয় বিচার করা যাউক। দিবাভাগে স্থলভাগ সমুদ্র অপেক্ষা শীঘ্র উত্তপ্ত হয় এবং রাত্রিতে শীঘ্র শীতল হয়। এজন্য দিবাভাগে সমুদ্র সন্নিহিত স্থানের ভূমির উষ্ণতাবশতঃ তথাকার বায়ু উষ্ণ ও লঘু হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয় এবং সমুদ্র হইতে অপেক্ষাকৃত শীতল ও ভারি বায়ু স্থলাভিমুখে প্রবাহিত হয়। দিবাভাগে ভূমির উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ সমুদ্র-বাতাসের বেগেরও বৃদ্ধি

হইতে থাকে। দিবসে স্থলভাগের বায়ু উষ্ণ ও জলভাগের বায়ু শীতল থাকে, কিন্তু সন্ধ্যার পর হইতে বিকিরণ-প্রণালীতে ভূমির তাপ প্রচুর পরিমাণে নষ্ট হওয়াতে এবং জলভাগের তাপ শীঘ্র বিকীর্ণ না হওয়াতে, রাত্রিতে উক্ত বায়ু ঠিক বিপরীতভাবাপন্ন হয় অর্থাৎ তখন স্থলের বায়ু শীতল এবং জলভাগের বায়ু উষ্ণ হইয়া উঠে। এজন্য রাত্রিতে স্থলভাগ হইতে সমুদ্রের দিকে বাতাস বহিয়া থাকে।

৩৫। ভারতের মৌসুমী বাতাস। শীতকালে পঞ্জাব, ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চল প্রদেশ, ও ভারতের অন্যান্য অংশ ভারতসমুদ্র অপেক্ষা অধিক শীতল হয়। এজন্য ঐ স্থানের বায়ুচাপ তখন অন্যান্য অংশাপেক্ষা বেশী হওয়াতে, ঐ স্থান হইতে দক্ষিণাভিমুখে বাতাস বহিয়া থাকে। শীতল স্থানের বাতাস অবশ্য শীতল হইবে। এজন্য ঐ উত্তরে বাতাস শীতল। গাঙ্গেয় সমভূমিতে ঐ বাতাস উত্তরপশ্চিম দিক্ হইতে আইসে। কিন্তু উড়িষ্যায় ও বঙ্গদেশের পূর্ব্বাংশে ঐ বাতাস উত্তর ও ঈশানকোণ হইতে আইসে। বঙ্গসাগরের উত্তরাংশেও শীতকালে ঈশানকোণ হইতে বাতাস বহে। এই সময়ের বাতাসকে শীতের মৌসুমী বাতাস বলে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিক্ হইতে বাতাস বহে। তবে বঙ্গসাগরে ঈশানকোণ হইতে বাতাস বহিয়া থাকে বলিয়া, ইহাকে কখন কখন ঈশানের মৌসুমী বাতাসও বলা যায়।

ঐ শীতের মৌসুমী বাতাসের পর দুই তিন মাস কোন নির্দ্দিষ্ট দিক্ হইতে বাতাস প্রবাহিত হয় না। কিন্তু গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই পঞ্জাব উষ্ণ হওয়াতে তথাকার বায়ুর চাপ কম হইতে থাকে। অবশেষে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে বঙ্গসাগর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী এবং পঞ্জাব সর্ব্বাপেক্ষা কম চাপের স্থান হয়। এজন্য তখন কম চাপের স্থান, পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের

দিকে বাতাস বহিয়া থাকে। বর্ষা শেষ পর্য্যন্ত চাপের প্রায় ঐরূপ অবস্থা থাকে। অবশেষে আশ্বিন মাসে আবার ভারতের উত্তরাংশে বায়ুচাপ বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই বাতাসকে গ্রীষ্মের মৌসুমী বাতাস বলে।

যেমন ভারতের বিভিন্ন অংশে শীতকালের মৌসুমী বাতাস বিভিন্ন দিক্ হইতে প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ গ্রীষ্মকালের মৌসুমী বাতাসও ভারতের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন দিক্ হইতে হয়। এই সময়ে ভারতের দুই পার্শ্বের দুই সাগর হইতে বাতাস বহিতে থাকে। আরবসাগর হইতে বাতাস দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে বহে। উড়িষ্যাতে পর্য্যন্ত ঐ আরবসাগরের পশ্চিমে বাতাস অনুভূত হয়। কিন্তু বঙ্গসাগর হইতে বাতাস বহিয়া বঙ্গদেশ, আরাকাণ, পূর্ব্ববঙ্গদেশ, আসাম, ও গাঙ্গেয় সমভূমির অন্যান্য অংশে বহিতে থাকে। কিন্তু বঙ্গসাগরে ঐ বাতাস দক্ষিণপশ্চিম বা নৈঋতকোণ হইতে বহে বলিয়া, উহাকে নৈঋতের মৌসুমী বাতাস বলে।

আমাদের দেশে যে দুইটি বাতাস সচরাচর বহিয়া থাকে, তদ্বিষয় এখানে বর্ণিত হইল। মৌসুমী বাতাস বৎসরের ৪।৫ মাস একদিকে, ও অপর ৪।৫ মাস বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়। অস্ট্রেলিয়া ও চীনসমুদ্রেও মৌসুমী বাতাস দেখা যায়। কিন্তু ঐ সকল বাতাসের দিক্, আমাদিগের দেশের বাতাসের দিক্ হইতে ভিন্ন।

৩৬। নিয়ত বাতাস। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরে, আতলান্তিক সমুদ্রের মধ্যভাগে এবং ভারত সমুদ্রের দক্ষিণাংশে বাতাস একই দিকে বার মাসই বহিয়া থাকে। ইহাকে এজন্য নিয়তবাতাস বলে। উহা নিরক্ষবৃত্তের উত্তরে ঈশানকোণ হইতে এবং উহার দক্ষিণে পূর্ব্বদক্ষিণ কোণ হইতে বহিয়া থাকে।

৩৭। **ঝটিকা।** প্রবলবেগে বাতাস বহিলে, তাহাকে ঝড় বা ঝটিকা বলে। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে শিলাবৃষ্টি, বৃষ্টি, বজ্রপাত, বিদ্যুৎ প্রায় হইয়া থাকে। কিন্তু ঝড় হইলেই যে বৃষ্টি হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই।

৩৮। **ধূলিঝড়।** কোন স্থানের অনেকখানি বায়ু প্রবলবেগে ঊর্দ্ধগামী হইলেই ঝড়ের উৎপত্তি হয়। ঊর্দ্ধগামী বায়ুর স্থান পূরণার্থ চতুর্দ্দিক হইতে বাতাস যায়। চৈত্রবৈশাখ মাসে পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ প্রভৃতি অত্যন্ত উষ্ণ হয়। তখন ভূপৃষ্ঠ-সংলগ্ন বায়ুস্তর অত্যন্ত উষ্ণ ও লঘু হইয়া উপরে উঠিতে থাকে এবং চারিদিক হইতে বাতাস আসিয়া ঐ স্থান পূরণ করে। এইরূপে তথায় সময়ে সময়ে ধূলিঝড় হইয়া থাকে। বঙ্গদেশেও অনেকে ঐরূপ কিন্তু নিতান্ত অল্পপরিসর ধূলিঝড় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। মনোনিবেশপূর্ব্বক দেখিলে প্রত্যক্ষ হইবে যে, কিরূপে মধ্যভাগের বায়ু ঘূরিতে ঘূরিতে শুষ্কতৃণ ধূলি ইত্যাদি লইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, এবং কিরূপে ঐরূপ ঘূরিতে ঘূরিতে অগ্রগামী হয়। বাস্তবিক, ধূলিঝড়ের দুই প্রকার গতি আছে। তাহার ঘূর্ণন, এক গতি এবং ঘূরিতে ঘূরিতে অগ্রগমন, আর একটি গতি। ধূলিঝড়ের মধ্যভাগের বায়ু ঊর্দ্ধগামী হওয়াতে, তথাকার চাপ কম পড়ে। এজন্য চারিদিকের বাতাস তথায় যাইতে চেষ্টা করে। একটি জলপূর্ণ হাঁড়ির তলে ছিদ্র করিলে দেখা যায় যে, যেমন ঐ ছিদ্র দিয়া জল বহির্গত হইতে থাকে, তেমনই হাঁড়ির জল ঘূরিতে ঘূরিতে ঐ স্থানটিকে কেন্দ্র করিয়া তদভিমুখে আসিতে চেষ্টা করে।

৩৯। **পশ্চিমে ঝড়।** বঙ্গদেশে ধূলিঝড় বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে প্রবল পশ্চিমে ঝড় অনেক সময় সর্ব্বনাশ করে। চৈত্র মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের কয়েক দিবস পশ্চিমে ঝড়ের

সময়। বৈকালে পশ্চিম ও উত্তরপশ্চিমে প্রায়ই মেঘ উৎপন্ন হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঝড়বৃষ্টি ও কথনকথন শিলা হইতে থাকে। এজন্ত লোকে 'কাল' বৈশাখের বৈকালকে ভয় করে।

৪০। **ঘূর্ণিঝড়।** ধূলিঝড় অতীব প্রবল ও ভীষণ হইলে তাহাকে ঘূর্ণিঝড় বলে। এই ঝড়ের পরিসর ১ মাইল হইতে কয়েক হাতমাত্র হইয়া থাকে। কিন্তু যে পথ দিয়া যায়, তথাকার ঘর বাড়ী, গাছ পালা, সমস্ত বিনষ্ট করিয়া সমভূমি করিয়া দেয়। ইহা নিতান্ত অল্পক্ষণস্থায়ী। মিসিসিপি নদীর পশ্চিমে বিস্তীর্ণ সমভূমিতে বহুসংখ্যক ঘূর্ণিঝড় সময়ে সময়ে উৎপন্ন হইয়া উহাদিগের পথের যাবতীয় দ্রব্যকে বিনষ্ট করিয়া যায়।

ভারতে ঘূর্ণিঝড় সচরাচর হয় না। বিগত ২৬শে চৈত্র তারিখে সন্ধ্যাকালে ঢাকাতে যে ঘূর্ণিঝড় হইয়াছিল, তাহার তুল্য ভয়ানক ভারতে আর শুনা যায় নাই। উহার পথের পরিসর ৪০০ শত হাতের বেশী ছিল না। ঢাকা ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকলের উপর দিয়া দক্ষিণপশ্চিম দিক্ হইতে পূর্ব্বোত্তরাভিমুখে ভয়ঙ্কর বেগে ঘূরিতে ঘূরিতে গমন করে। ৩।৪ মিনিটমাত্র মধ্যে ৩॥০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া উহা প্রায় ২০০ শত লোক হত ও সহস্রাধিক লোক আহত এবং দুই তিন লক্ষ টাকার ধনসম্পত্তি বিনষ্ট করে। পুনশ্চ গত ১২ই বৈশাখ তারিখে হুগলির নিকটবর্ত্তী ভদ্রেশ্বর নামক স্থানে ৫।৬ মিনিট-কালমাত্রস্থায়ী এক ঘূর্ণিঝড় হয়। উহা ৫০০।৬০০ শত হস্ত মাত্র প্রশস্ত ছিল। বড় বড় নৌকা গঙ্গা হইতে উত্তোলিত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ঘূর্ণিঝড়ের কারণ কি, তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। তবে দেখা গিয়াছে যে, ঘূর্ণিঝড়ের অগ্রে উহার পথের উভয় পার্শ্বের বায়ুর উষ্ণতা ও সিক্ততার অতিশয় প্রভেদ থাকে।

৪১। জলস্তম্ভ। ঘূর্ণিঝড় বিস্তৃত জলভাগের উপর উৎপন্ন হইলে জলস্তম্ভের উৎপত্তি করে। অত্যন্ত গরম নির্ব্বাতাস দিবসে ঘূর্ণিঝড় এবং জলস্তম্ভ ঘটিয়া থাকে। জলস্তম্ভ হস্তীর শুণ্ডাকাররূপ ধারণ করে এবং সময়ে সময়ে উপর হইতে মেঘ নামিয়া আসিয়া ঊর্দ্ধগামী জলস্তম্ভের সহিত সংযুক্ত হয়। সন ১২৬৬ সালের আশ্বিন মাসে কলিকাতার নিকট দমদম নামক গ্রামের বিলে একটি জলস্তম্ভ ১,৫০০ ফুট বা সহস্র হাত উচ্চ হইয়াছিল। অর্দ্ধমিনিটের কম সময় থাকিয়া মেঘ ভাঙ্গিয়া যায়। তাহাতে অর্দ্ধচতুরস্র মাইল স্থান ৬ ইঞ্চ জলে প্লাবিত হয়।

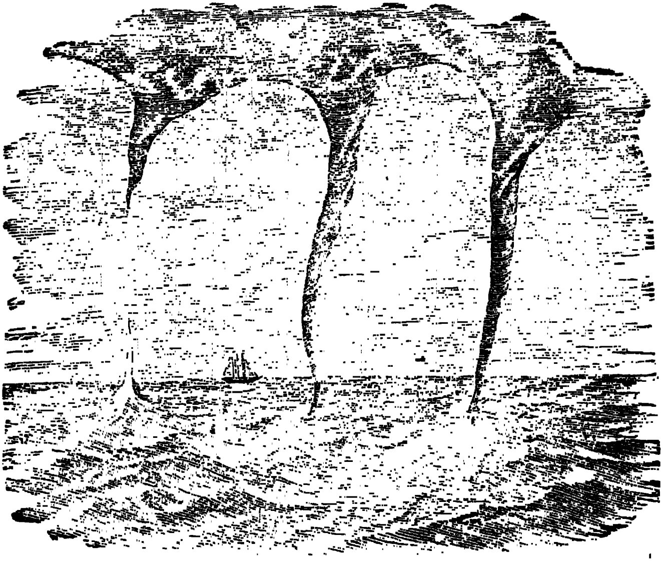

৮ চিত্র। জলস্তম্ভ।

১২৮১ সালের চৈত্রমাসে ব্রহ্মপুত্রনদের শাখা যমুনানদীতে একটি জলস্তম্ভ উৎপন্ন হয়। দিবসে অত্যন্ত গ্রীষ্ম হয়। সূর্য্যাস্তের পর, নদী-

জলের উপরে প্রবল ঘূর্ণিঝড় হইয়া ৬।৭ হাত পরিমিত একটি জলস্তম্ভ উৎপাদন করে। পরে প্রবলবেগে নদীর তটে গিয়া উপস্থিত হয়। অনেকগুলি বোঝাই নৌকা বিচূর্ণ হইয়া যায়। একটি বড় নৌকা শূন্যে উত্তোলিত হইয়া ১০ হাত উচ্চ বাঁধের উপর দিয়া কিয়দ্দূর চালিত হয়। উপরের চিত্রে জলস্তম্ভের আকৃতি দেখান গেল।

৪২। **বাতাবর্ত্ত।** ঘূর্ণিঝড় বিস্তৃত ও দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে বাতাবর্ত্ত নামে অভিহিত হয়। জলে যেরূপ আবর্ত্ত জন্মে, তদ্রূপ ঘূর্ণিঝড় ও বাতাবর্ত্ত উভয়ই উর্দ্ধগামী বায়ুর আবর্ত্তমাত্র। ঐ আবর্ত্তের কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে ঝড় সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ও ভীষণ। কিন্তু কেন্দ্র প্রায়ই নির্ব্বাত এবং কদাপি তথায় মৃদু বাতাস বহে। এই নির্বাত স্থান ৭।৮ মাইল হইতে ১৪।১৫ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। উহার উভয় প্রান্তে ঝড় পরস্পর বিপরীত দিকে বহমান থাকে। ভারতপ্রভৃতি নিরক্ষবৃত্তের উত্তরাংশে উহা ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে (৯ চিত্র) ঘুরিয়া থাকে অর্থাৎ উহা প্রথমতঃ পূর্ব্বদিকে আরম্ভ হইয়া পরে উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণদিক্ হইতে বহমান হইয়া অবশেষে পূর্ব্বদিকে গিয়া শেষ হয়। অস্ত্রেলিয়া প্রভৃতি নিরক্ষবৃত্তের দক্ষিণাংশে ঘড়ির কাঁটা যেরূপ ঘুরিয়া থাকে, সেই দিকে ঘুরে।

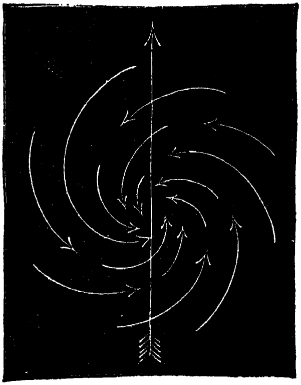

৯ চিত্র। বাতাবর্ত্তের ঘূরিবার প্রকৃতি ও দিক্।

৪৩। **বাতাবর্ত্তের গতি।** বাতাবর্ত্তের অগ্রগতি নানা স্থানে নানা হারে হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে,

বাতাবর্ত্তের ঘূর্ণনের বেগ ও দিক্,উহার অগ্রগতির বেগ ও দিক্ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সন ১২৮১ সালের কার্ত্তিক মাসে বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরে যে ঝড় হয়, তাহার গতিপথ নিম্নের মানচিত্র হইতে সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। ঐ ঝড়ের অগ্রগতির বেগ ৭ হইতে ১০ মাইল মাত্র। কিন্তু ঘূর্ণনের বেগ স্থানে স্থানে ৫০।৬০ মাইল হইয়াছিল। ঐ বাতাবর্ত্তের বিস্তার ৫০ মাইলের বেশী ছিল না।

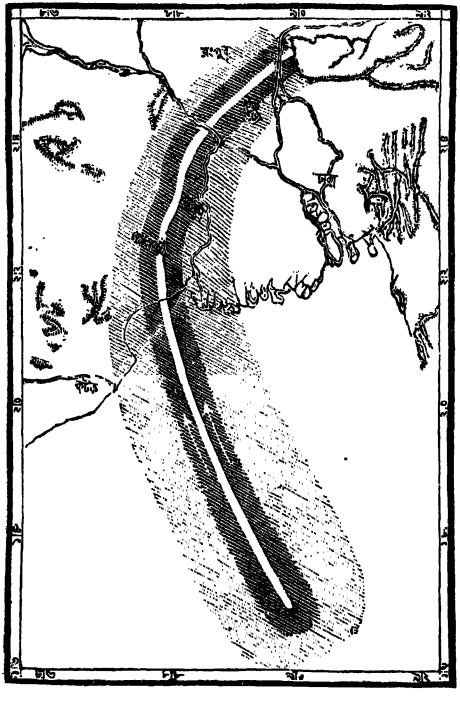

৪ মানচিত্র। সন ১২৮১ সালের মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমানের বাতাবর্ত্তের উৎপত্তি-স্থল, গতির দিক্ ও পরিসর দেখান গেল। মধ্যের শাদা বক্র স্থানটিতে ঝড় সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া দুই পার্শ্বে ক্রমশঃ কম ছিল।

৪৪। **বাতাবর্ত্তের পথ।** বঙ্গসাগরে বাতাবর্ত্ত প্রায়ই উত্তরপশ্চিম দিকে গমন করে। যখন সাগর পার হইয়া ভূ-ভাগে পঁহুছে, তখন উহা উত্তরপশ্চিম হইতে বাঁকিয়া পূর্ব্বাভিমুখ হয়। এই নিয়মের একটি মাত্র ব্যতিক্রম এপর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। সন ১২৮৩ সালের কার্ত্তিক মাসে বাখরগঞ্জজেলায় যে ঝড় ও ঝড়জনিত সমুদ্রতরঙ্গ হয়, সেইটি মাত্র কেবল পশ্চিমদক্ষিণ কোণ হইতে পূর্ব্বোত্তর কোণাভিমুখে গমন করে। মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমানের পূর্ব্বোল্লিখিত কার্ত্তিক মাসের ঝড়ের পথ ৪ মান চিত্রে প্রকাশিত হইল। এতদ্দ্বারা আমাদের দেশের বাতাবর্ত্তের অগ্রগতির পথ অনায়াসে বুঝা যাইবে।

৪৫। **বাতাবর্ত্তের কাল।** এক মৌসুমী বাতাস পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য মৌসুমী বাতাস হইবার সময়ই বাতাবর্ত্ত ঘটিয়া থাকে। আশ্বিনকার্ত্তিক মাসে গ্রীষ্মের মৌসুমী বাতাস পরিবর্ত্তন হইয়া শীতের মৌসুমী বাতাস বহিতে আরম্ভ করে। ঐ দুই মাসেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাতাবর্ত্ত দেখা গিয়াছে। চৈত্র মাসের শেষ ও বৈশাখমাস, বাতাবর্ত্তের আর একটি কাল। বঙ্গদেশ কিম্বা ভারতের অন্যান্য অংশে যখন বাতাবর্ত্ত দ্বারা বিস্তর প্রাণী ধনসম্পত্তি বিনষ্ট হয়, তখনই কেবল আমরা উহার সংবাদ পাই। বঙ্গসাগরে এমন বৎসর যায় না, যে বৎসরে একটি বা ততোধিক বাতাবর্ত্ত না ঘটিতেছে। বাতাবর্ত্তের কাল আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ১০।১১ বৎসর অন্তর উহা সমধিক বেশী সংখ্যায় হয়।

৪৬। **বাতাবর্ত্তের সংস্থান।** আরবসাগরে বাতাবর্ত্ত নিতান্ত অল্প; বঙ্গসাগরে তদপেক্ষা বেশী এবং চীনসমুদ্রে উহা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। নিরক্ষবৃত্তের উত্তর ও দক্ষিণ ৬।৭ অক্ষাংশ মধ্যে বাতাবর্ত্ত ঘটিতে দেখা যায় না। বঙ্গসাগরের মধ্যস্থল ও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাংশ অর্থাৎ

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পূর্ব্বে বঙ্গসাগরের বাতাবর্ত্তের প্রধান উৎপত্তিস্থল বলিয়া বোধ হয়।

৪৭। **বাতাবর্ত্তের অনুসঙ্গী।** বাতাবর্ত্তের সঙ্গেসঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি হইতে দেখা যায়। মেদিনীপুরের বাতাবর্ত্তে এক দিবসের মধ্যে ১০ ইঞ্চ বৃষ্টি হয়। কেন্দ্রের কয়েক মাইলে বড় বেশী হয় না। বাতাবর্ত্তের উৎপত্তিসময় ঘনঘন বিদ্যুৎ হইতে থাকে, কিন্তু পরে আর দেখা যায় না। বাতাবর্ত্তকালে বায়ুমণ্ডলে প্রচুর তাড়িত উৎপন্ন হওয়াতেই, বোধ হয়, স্থানে স্থানে আলোকময় হইতে দেখা যায়।

৪৮। **বাতাবর্ত্তের পূর্ব্বলক্ষণ।** বাতাবর্ত্তের পূর্ব্বলক্ষণ জানা থাকিলে অনেক সময় বিপৎপাত হইতে প্রাণ রক্ষা করা যাইতে পারে। সাগর-বিহারী নাবিকগণের এই সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকা কতদূর প্রয়োজন, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। অমুক স্থানে বাতাবর্ত্ত হইয়া ঐ দিকে প্রবাহিত হইতেছে, অনেক পূর্ব্বে জানিতে পারিলে, অনায়াসে তাহারা আপন আপন জাহাজ বাতাবর্ত্ত পথ হইতে সরাইয়া রাখিয়া ধন প্রাণ রক্ষা করিতে পারে। গত বৎসরের জ্যৈষ্ঠ মাসে কটকযাত্রী সার-জন-লরেন্স নামক জাহাজ, পোতাধ্যক্ষের অসাবধানতাবশতঃ প্রায় এক হাজার নরনারীসহ অতল সাগরগর্ভে নিমজ্জিত হয়।

বাতাবর্ত্ত হইবার পূর্ব্বে কয়েকদিবস সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ও সূর্য্যাস্তের পরে আকাশ লালবর্ণ দেখায়। বাতাবর্ত্ত দুই এক দিবস মধ্যে ঘটিবে, তাহা জানিবার পক্ষে বায়ুমান-যন্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উপকারক ও বিশ্বাস্য। চারি পাঁচ দিবস হইতে বায়ুমানের পারদ নামিতে থাকে। বঙ্গসাগরের উত্তরে বাতাবর্ত্ত জন্মিলে, বঙ্গদেশে বায়ুমান-যন্ত্রের পারদের অবনতি ঘটিতে থাকে। কিন্তু প্রবল ঝড় দেখিলেই

বাতাবর্ত্ত মনে করা উচিত নহে। বঙ্গদেশে ও উড়িষ্যার উপকূলে যত বেগেই বাতাস বহুক না কেন, যদি ঐ বাতাস দক্ষিণে হয় এবং কিঞ্চিৎ মাত্রও পশ্চিম হইতে আইসে, তবে বাতাবর্ত্তের কোন আশঙ্কা নাই। বৈশাখজ্যৈষ্ঠ ও আশ্বিনকার্ত্তিক মাসের একপ্রকার নির্ব্বাত দিবস সুলক্ষণ নহে।

৪৯। **বাতাসের কার্য্য।** পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, ঝড়ের মধ্যভাগে বাতাসের প্রাবল্য অধিক। এজন্য ঐ পথে বৃক্ষাদি, ঘর বাড়ী, নৌকা জাহাজ, পতিত হইলে তাহারা একবারে উৎসন্ন হইয়া যায়। কিন্তু ঝড়বশতঃ যত কেন ধন প্রাণ বিনষ্ট হউক, ঝড়ের জন্য সমুদ্রে যে সময়ে সময়ে অতীব প্রকাণ্ড তরঙ্গ জন্মে, তদ্দ্বারা কত অসংখ্য অসংখ্য পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, নরনারী, বৃক্ষাদি সমুদ্রসাৎ হয়, তাহা ভাবিলে শোকে বিহ্বল হইতে হয়। সন ১২৭১ সালের আশ্বিন মাসের ঝড়ে এই রূপ একটি ঢেউ দ্বারা গঙ্গাসাগর হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান ও উভয় পার্শ্ব ৭ হাত হইতে ১০ হাত জলে প্লাবিত হইয়া যায়। তাহাতে প্রায় ৪৮,০০০ হাজার লোক ও লক্ষাধিক গরু বাছুর বিনষ্ট হয়।

কিন্তু সন ১২৮৩ সালের কার্ত্তিক মাসে বঙ্গসাগরে ঝড় হওয়াতে যে ঢেউ উৎপন্ন হয়, তাহাতে বাখরগঞ্জজেলা, নোয়াখালি, দক্ষিণ সাবাজপুর ইত্যাদি স্থানে যে হৃদয়বিদারক প্রাণীবিনাশ-কাণ্ড সংসাধিত হয়, তাহা স্মরণ হইলে প্রকৃতির বিচিত্র লীলা ও অনন্ত শক্তিতে স্তম্ভিত হইতে হয়। পূর্ণিমার পরদিবস একেইত জোয়ার অত্যন্ত প্রবল ছিল, তাহার উপর আবার দক্ষিণে বাতাস সহায় হইয়া ঝড়ো ঢেউ দ্বারা প্রলয় ব্যাপারকে তুমুল করিয়া তুলে। গভীর রাত্রিতে জনমানব কোথায় বিশ্রাম লাভ করিবে, না ৬ হাত হইতে ৩০ হাত

উচ্চ সমুদ্রের ঢেউ আসিয়া একবারে লক্ষাধিক মনুষ্যকে অকালে বিনষ্ট করে। ঐ স্থানে ঐটিই প্রথম ঢেউ নহে। সন ১২২৯ সালে এই রূপে সমুদ্রের এক ঢেউ উৎপন্ন হয়। উহাতে প্রায় ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার লোক জীবন বিসর্জ্জন করে।

৫০। সংক্ষিপ্তসার। আমরা এই অনুচ্ছেদে নানাবিধ বাতাসের বিষয় আলোচনা করিলাম। বায়ুমণ্ডলের চাপ নানা কারণে নানা স্থানে সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। দুইটি বিভিন্ন স্থানের বায়ুচাপের ন্যূনাধিক্য ঘটিলে, বেশী চাপের স্থান হইতে কম চাপের স্থানে বাতাস বহে। তবে বায়ুচাপের বৈষম্যই বাতাসের মুখ্য কারণ। প্রবল বাতাসকে ঝড় বলে। বঙ্গদেশে পশ্চিমেঝড় সকলেই গ্রীষ্মকালে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। পঞ্জাবে ধূলিঝড় উৎপন্ন হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে প্রকাণ্ড ধূলিঝড় প্রায় দেখা যায় না। ধূলি ঝড় বিস্তৃত হইলেই ঘূর্ণিঝড় নামে অভিহিত হয়। আবার ঘূর্ণিঝড় বিস্তৃত হইলেই বাতাবর্ত্ত নাম পায়। বস্তুতঃ ধূলিঝড়, ঘূর্ণিঝড় ও বাতাবর্ত্ত এই তিনের উৎপত্তির কারণ ও প্রকৃতি একই প্রকার। উহাদিগের দুইটি গতি থাকে। একটি কেন্দ্রাভিমুখে ঘূর্ণন, অপরটি ঐ রূপে ঘূরিতে ঘূরিতে অগ্রগমন। ঐ দুইটি গতি পৃথক্ বুঝিতে হইবে। ঘূর্ণিবায়ু স্থলভাগের উপর হইলে ধূলিঝড়, এবং জলের উপর হইলে জলস্তম্ভের উৎপত্তি করে। পরিশেষে, বাতাবর্ত্তের উৎপত্তি, প্রকৃতি, কাল, পূর্ব্বলক্ষণ বিষয়ে যতদূর সামান্যতঃ বলা যাইতে পারে, বর্ণিত হইয়াছে। বাতাবর্ত্ত মৌসুমী বাতাসের পরিবর্ত্তনের সময় ঘটিয়া থাকে। বঙ্গসাগরে উহা উত্তরপশ্চিম দিকে বহিয়া ভারতে পঁহুছিয়া পূর্ব্বদিকে বাঁকিয়া পূর্ব্বউত্তরদিকে প্রবাহিত হয়। বাতাস ও ঝড় দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়বৃদ্ধির বিষয় পরে বিবৃত হইবে।

৪ § জলবায়ু।

৫১। জলবায়ু। কোন দেশের জলবায়ু বলিলে, তথাকার বায়ুর সাধারণ অবস্থা, বিশেষতঃ, উহার সিক্ততা এবং উষ্ণতা বুঝায়। জলবায়ু বিচার করা বড় প্রয়োজনীয়; যেহেতু উহার ভাল মন্দ অবস্থার উপর আমাদিগের স্বাস্থ্য বিশেষরূপে নির্ভর করে। এস্থলে আমরা বিভিন্ন স্থানের বায়ুর উষ্ণতা ও সিক্ততার বিষয় আলোচনা করিব। বায়ুর চাপ আলোচনা করিয়া যেমন ঝড়, বাতাস প্রভৃতির সম্ভাবনা ও কারণ বুঝিতে পারি, তেমনই বায়ুর উষ্ণতা ও সিক্ততা বিষয়ের জ্ঞানদ্বারা দেশের জলবায়ু নিরূপিত হয়।

৫২। নিরক্ষবৃত্ত হইতে দূরত্বানুসারে উষ্ণতা-বিচার। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সূর্য্যকিরণ যত তির্য্যক্‌ভাবে আসিবে, তাহা হইতে তাপ তত কম পাওয়া যাইবে, এবং যত লম্বভাবে পড়িবে, তাপ তত অধিক পাওয়া যাইবে। মাদ্রাজে মধ্যাহ্নকালে সূর্য্য ঠিক মস্তকোপরি থাকিলে, কলিকাতার লোকের মস্তকোপরি সূর্য্য থাকিবে না, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লোকদিগের নিকট সূর্য্যকিরণ তখন তির্য্যক্‌ভাবে আসিবে, আরও উত্তরে আরও বাঁকিয়া যাইবে। কিন্তু যতই অধিক বাঁকিবে, ততই কম তাপ পাওয়া যাইবে। এই নিয়মানুসারে দেখা যায় যে, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে ভারতবর্ষে যত গ্রীষ্ম অনুভূত হয়, নিরক্ষবৃত্তের অনেক উত্তরাংশস্থিত এশিয়ার মধ্যভাগ, ইয়ুরোপ প্রভৃতিতে তত গ্রীষ্ম হয় না। সাধারণতঃ, নিরক্ষবৃত্ত হইতে যেস্থান যত দূরে, সে স্থান তত শীতল।

কিন্তু পৃথিবীর জল ও স্থলের সংস্থানভেদে উপরি উক্ত নিয়মের প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে রাজপুতানা, পঞ্জাব, মালব-অধিত্যকা প্রভৃতি ভারতের মধ্যে উষ্ণতম স্থান।

পঞ্জাবপ্রদেশে তখন বায়ুর উষ্ণতা প্রায়ই ১০০°ফা ঘটিয়া থাকে। আষাঢ় মাসে বৃষ্টি আরম্ভ হইলে উষ্ণতা কমিতে থাকে। কিন্তু পঞ্জাবে ও সিন্ধুদেশে বৃষ্টি একপ্রকার না হওয়াতে উহাদিগের উষ্ণতার হ্রাস হয় না। কিন্তু বৃষ্টি শেষ হইবার পর আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাস হইতে পঞ্জাব, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ প্রভৃতি ভারতের উত্তরাংশেস্থিত স্থানসকল খুব শীতল হইতে থাকে। শীতকালে উপরি বর্ণিত নিয়মমত ভারতের যেস্থান নিরক্ষবৃত্ত হইতে যত দূরে অবস্থিত, সেস্থান তত অধিক শীতল। বাস্তবিক, তখন পঞ্জাব ও রাজপুতানায় খুব বেশী শীত।

৫৩। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে উচ্চতানুসারে উষ্ণতা বিচার। কি নিরক্ষবৃত্তের উপরে, কি অন্য স্থানে, সর্ব্বত্রই পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ হইতে যতই ঊর্দ্ধে উত্থিত হওয়া যায়, ততই বায়ুর উষ্ণতা ক্রম দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে যখন বঙ্গদেশের নিম্নস্থান সকলে গ্রীষ্ম অসহ্য হইয়া উঠে, তখন দারজিলিং, সিমলা প্রভৃতি উচ্চস্থান সকলে অতিশয় শীত। দেখ, কলিকাতায় বৈশাখ মাসের গড় উষ্ণতা ৮৪.৩°ফা, আর ৬,৯১২ ফুট উচ্চে দারজিলিঙ্গে ঐ মাসের উষ্ণতা ৬৩°ফা। কলিকাতায় পৌষ মাসের উষ্ণতা ৬৯.৮°ফা, দারজিলিঙ্গে ঐ মাসের ৪০.৬°ফা।

উপরের বায়ু নিম্নের বায়ু অপেক্ষা শীতল হইবার প্রধান দুইটি কারণ এখানে উল্লেখ করা গেল। বায়ু কিরূপে উত্তপ্ত হয়, তদ্বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে একটি প্রধান কারণ উপলব্ধ হইবে। উত্তপ্ত ভূ-পৃষ্ঠের সংস্পর্শে নিম্নের বায়ু আসাতে, ও পৃথিবীদ্বারা বিকীর্ণ তাপ নিম্নস্থ বায়ুরাশি শোষণ করাতে, উহা উষ্ণ হইয়া থাকে। সুতরাং অনেক উচ্চে উত্তপ্ত ভূ-পৃষ্ঠের অভাবে তথাকার বায়ু উষ্ণ হইতে পারে না। দ্বিতীয় কারণ এই যে, বায়ু উষ্ণ সুতরাং লঘু হইলে উপরে

উঠিয়া প্রসারিত হয়। এই প্রসারণে তাহার উষ্ণতা নিতান্ত কমিয়া গিয়া উহা শীতল হইয়া পড়ে।

৫৪। **চিরতুষার-রেখা।** হিমালয়ের উচ্চস্থান সকল এত শীতল যে, তথায় বৃষ্টি, শিশির প্রভৃতি জলের পরিবর্ত্তে জলীয় বাষ্প তুষাররূপে পতিত হয়। সেখানে এত তুষার পতিত হয় যে, উহা স্থানে স্থানে অনেক উচ্চ হইয়া উঠে। শীতকালে তুষার প্রচুর পতিত হয়। গ্রীষ্মকালে পর্ব্বতাদির নিম্নস্থানের সমস্ত তুষার সূর্য্যোত্তাপে গলিয়া গিয়া অদৃশ্য হইতে পারে, কিন্তু অত্যুচ্চ স্থানে যত পতিত হয়, তৎসমুদায় গলিত হয় না। এজন্য হিমালয়ের অত্যুচ্চ স্থানসকল চিরকাল তুষারে আচ্ছন্ন থাকে। যে রেখার উপরে গ্রীষ্মকালেও সমস্ত তুষার না গলিয়া সঞ্চিত থাকে, তাহাকে চিরতুষার-রেখা বলে। বিভিন্ন স্থানের অবস্থান ও উচ্চতা ভেদে ঐ রেখা ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতায় দেখা যায়। হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে উহা প্রায় ২০,০০০ ফুট এবং দক্ষিণ পার্শ্বে প্রায় ১৬,০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। নিরক্ষবৃত্ত হইতে যতই উত্তরে এবং দক্ষিণে যাওয়া যায়, ততই ঐ রেখা নিম্ন হইতে থাকে। আইসলাণ্ড দ্বীপে উহা ৩,০০০ ফুট উচ্চে, আরও উত্তরে স্পিটজ্‌বর্জেন নামক দ্বীপে সমুদ্রজলের উপর ঐ রেখা দেখা যায়, অর্থাৎ তথায় সমভূমির উপর তুষার পতিত হইয়া জমা হইয়া থাকে।

৫৫। সমুদ্র হইতে দূরত্বানুসারে উষ্ণতা-বিচার।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, জল ও স্থল একই ভাবে সূর্য্যকিরণ প্রাপ্ত হইলে, স্থলভাগ জলভাগ অপেক্ষা শীঘ্র উষ্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু আবার স্থল অপেক্ষা জল অনেক বিলম্বে শীতল হয়। এই কারণবশতঃ যখন কলিকাতা, নোয়াখালি, পুরী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানসকল সূর্য্যোত্তাপে উষ্ণ হইয়া উঠে, বঙ্গসাগর তখন তত হয় না। এজন্য সমুদ্রের

অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ুবশতঃ সমুদ্র-উপকূলবাসীগণ গ্রীষ্মের প্রাখর্য্য ভোগ করেন না। অন্য পক্ষে, গরম সমুদ্র নিকটে থাকায় শীতকালে ঐস্থান সকলে দারুণ শীত হয় না। এজন্য পাটনা, বেহার অপেক্ষা কলিকাতায় শীত ও গ্রীষ্ম কম। এজন্য পুরী অপেক্ষা উড়িষ্যার ভিতরের স্থানসকলে বেশী গ্রীষ্ম।

৫৬। বিভিন্ন স্থানের বায়ুর সিক্ততা-বিচার। আমরা বিভিন্ন স্থানের উষ্ণতার তারতম্য হইবার কারণ দেখিলাম। এক্ষণে জলবায়ুর আর একটি অঙ্গ, সিক্ততা, বিচার করা যাউক।

৫৭। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে উচ্চতানুসারে আর্দ্রতা-বিচার। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, জলীয় বাষ্প বায়ু অপেক্ষা লঘু হওয়াতে উপরে উঠে। পরে উহা উচ্চস্থানের শীতল বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া স্বয়ং মেঘরূপ ধারণ করিয়া অবশেষে বৃষ্টিরূপে ভূতলে পতিত হয়। এতদ্দ্বারা সহজেই বুঝা যায় যে, ভূ-পৃষ্ঠ হইতে কয়েক মাইল পর্য্যন্ত বায়ু-মণ্ডলে জলীয় বাষ্প বর্ত্তমান থাকে। যে উচ্চতায় মেঘ থাকে, তাহার বেশী উপরে জলীয় বাষ্প থাকে না বলিয়া বোধ হয়।

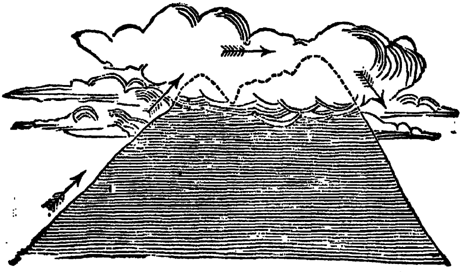

১০ চিত্র। পর্ব্বতের উপরিভাগে সর্ব্বদা মেঘ থাকে।

ভারতের পাহাড়ে স্থানসকলের সিক্ততা নিম্ন ভূমির সিক্ততা অপেক্ষা বেশী দেখা যায়। ভূ-পৃষ্ঠ হইতে কয়েক মাইল পর্য্যন্ত উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর সিক্ততা বৃদ্ধি পায়। বর্ষাকালে এবং কখন কখন শীতকালে উচ্চ পাহাড়ের বায়ু এত সিক্ত হয় যে, তাহা তখন

সর্ব্বদা মেঘে আচ্ছন্ন থাকে। উপরের চিত্রে তাহা দেখান গেল। এই রূপ, দারজিলিঙ্গে দেখা যায় যে, ঘরের ভিতরে, বাহিরে সর্ব্বত্রই মেঘ ও কুয়াসা গমনাগমন করিতে থাকে।

৫৮। **সমভূমির বিভিন্ন স্থানের আর্দ্রতা-বিচার।** আমরা নিম্ন ও উচ্চ স্থানের আর্দ্রতা বিচার করিলাম। এক্ষণে সমভূমির বিভিন্ন স্থানের আর্দ্রতা দেখা যাউক।

মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, যেস্থান সমুদ্রের যত নিকটে, সে স্থান তত অধিক আর্দ্র। কিন্তু এসকল স্থানে সমুদ্র হইতে বাতাস বহা আবশ্যক। কেননা সমুদ্র হইতে জলীয় বাষ্প বাতাসদ্বারা সেই স্থানে আনীত হইয়া, তাহাকে আর্দ্র করে। এই দুই কারণ থাকাতে, আমরা দেখিতে পাই যে, চট্টগ্রামের বার্ষিক আর্দ্রতা ৮০, কলিকাতা ও ঢাকার ৭৭, বহরমপুর ও যশোহরের ৭৫। সমুদ্র হইতে যতই দূরে যাওয়া যায়, ততই আর্দ্রতা কম দেখা যায়। এইরূপে, কটকের বার্ষিক আর্দ্রতা ৭০, সম্বলপুরের ৬৬, পাটনার ৬৫, গয়ার ৫৯। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ বঙ্গদেশ অপেক্ষা শুষ্ক। কিন্তু সমুদ্র হইতে বাতাস না আসিয়া ভূভাগ হইতে বাতাস বহিলে, সমুদ্রনিকটবর্ত্তী স্থানও অপেক্ষাকৃত কম আর্দ্র হয়। মাদ্রাজ সমুদ্রের উপকূলে থাকিলেও, উহার গড় বার্ষিক আর্দ্রতা ৭১ মাত্র।

বর্ষাকাল ব্যতীত শীতকালেও পঞ্জাব খুব আর্দ্র হয়। ইয়ুরোপেও এইরূপ শীতকালই খুব আর্দ্র সময়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে পঞ্জাব খুব শুষ্ক। উড়িষ্যা, মধ্যভারত, সমস্ত গাঙ্গেয় সমভূমিতে ফাল্গুনচৈত্রে বায়ু খুব শুষ্ক থাকে। পরিশিষ্টে ভারতের কয়েক স্থানের উষ্ণতা ও সিক্ততা দেওয়া গেল।

৫৯। **সংক্ষিপ্তসার।** আমরা বিভিন্ন স্থানের উষ্ণতা বিচার করিতে গিয়া দেখিলাম যে, উহা প্রধানতঃ নিরক্ষবৃত্ত হইতে

দূরত্ব, সমুদ্রজলসীমা হইতে উচ্চতা এবং সমুদ্র হইতে দূরত্ব,—এই তিনটির উপর নির্ভর করে। এজন্য পৃথিবীর মেরুসন্নিহিত দেশসকল, এবং নিরক্ষবৃত্তের নিকটবর্ত্তী থাকিলেও যথেষ্ট উচ্চ বলিয়া হিমালয়ের শৃঙ্গসমুদয়, সকল সময়েই তুষারে আবৃত থাকে। সমুদ্র নিকটে থাকিলে শীত ও গ্রীষ্মের প্রাখর্য্য কম হয়। এতদ্ভিন্ন, অন্যান্য অনেক কারণে দেশের উষ্ণতার তারতম্য ঘটে। কোন স্থান কঠিন শিলাময় কিম্বা বৃক্ষলতাদিহীন হইলে তথাকার বায়ু উষ্ণ হয়, কোন ভূমি জলা ও বনজঙ্গলযুক্ত কিম্বা শস্যশালিনী হইলে, তাহা অপেক্ষাকৃত শীতল হয়। এইরূপ আরও অনেক কারণে উষ্ণতার কম বেশী ঘটিয়া থাকে। পরে আর্দ্রতা বিচারকালে আমরা দেখিলাম যে, ভারতের উচ্চ পাহাড়সকল নিম্নভূমি অপেক্ষা বেশী আর্দ্র, এবং মোটামুটি, সমুদ্র হইতে যে স্থান যত নিকটে সে স্থান তত অধিক আর্দ্র। জলবায়ু-সংস্থান বিচার করা বড় কঠিন কার্য্য। কোন স্থান স্বাস্থ্যকর, কোন স্থান অস্বাস্থ্যকর, কোন স্থানে কোন বিশেষ বিশেষ রোগ উৎপন্ন হয়, আর কোন কোন স্থানে রোগী যাইলে নীরোগশরীর হয়। এইরূপ বহুবিধ প্রয়োজনীয় বিষয় ইহাতে আলোচিত হয়।

৫ § বৃষ্টি, নদী, তুষার, প্রস্রবণ প্রভৃতির ভূ-পৃষ্ঠের উপর কার্য্য।

৬০। **বৃষ্টিদ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়।** বৃষ্টির বিষয় দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ বৃষ্টির জল কোথা হইতে আইসে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করাতে দেখা গিয়াছে যে, সমস্ত আর্দ্র ভূমি, সরস সামগ্রী, সরোবর, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি হইতে সূর্য্যোত্তাপে জল বাষ্পীভূত হইয়া অন্তরীক্ষে মেঘ-রূপে নানা দেশদেশান্তরে চালিত

হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পুনর্ব্বার বৃষ্টিরূপে পতিত হইতেছে। তবেই দেখ, জলের রূপ-পরিবর্ত্তনের বিরাম নাই। জল বাষ্পীভূত না হইলে সমুদ্রের জল সমুদ্রে, জলা-ভূমির জল জলায়, বৃক্ষাদি জীবজন্তুর রস তাহাদিগের শরীরে থাকিয়া যাইত। যে স্থানে পুষ্করিণী, নদী প্রভৃতির জল নাই, সে স্থান চিরকালই জলশূন্য থাকিয়া জীবাদির প্রাণধারণ ও আবাস-অযোগ্য থাকিত। প্রকৃতির কি বিচিত্র শৃঙ্খলা! কতকগুলি নিয়মদ্বারা পৃথিবীর যাবতীয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে!

কিন্তু বৃষ্টি ও জল দ্বারা ভু-পৃষ্ঠ কি কেবল শস্যশালিনী ও জীবাদির আবাস-ভূমি হইতেছে? জল কি কেবল জীবাদির প্রাণধারণের নিমিত্ত নিয়ত নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে? এতদ্দ্বারা কি অপর কোন কার্য্য হইতেছে না? এবিষয় বিচার করা কর্ত্তব্য হইতেছে।

বৃষ্টির জল ভূমিতে পতিত হয়, এই জলের কিয়দংশ বাষ্পরূপে পুনর্ব্বার বায়ুতে অদৃশ্য হয়, কিয়দংশ ভূমির নীচে চলিয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ নিম্নদিকে গড়াইতে গড়াইতে প্রথমতঃ নালার সৃষ্টি করিয়া পরে বহুসংখ্যক নালা একত্রিত হইয়া বড় নালা, বহুসংখ্যক বড় নালা একত্রিত হইয়া গড়াইতে গড়াইতে নদীতে, আবার অনেকগুলি নদী একত্রিত হইয়া খাল, বিল, পুষ্করিণী পূর্ণ করিয়া অবশেষে সমুদ্রে উপনীত হয়। এইরূপে, হিমালয়ে পতিত জলকণা উত্তরপশ্চিমাঞ্চল দিয়া বঙ্গদেশে আসিয়া সমুদ্রের এক ফোঁটা জল হইতেছে। জলের কার্য্যের বিরাম নাই।

কিন্তু বৃষ্টিজল কেমন নির্ম্মল, আর নদীজল, বিশেষতঃ বর্ষাকালের জল, কত ঘোলা! নদীর ঘোলা জল কলসীতে রাখিয়া দাও, কলসীর তলে কত কর্দ্দম থিতাইয়া পড়িবে। তবেই দেখ, বৃষ্টিজল নদীতে পড়িবার সময় দেশের মৃত্তিকা লইয়া যাইতেছে। যে স্থলভাগ

হইতে বৃষ্টিজল গড়াইতে গড়াইতে নদীতে প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্থলভাগের মৃত্তিকা দূরীভূত করিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশ ক্ষয় করিতেছে। কর্ষিত ভূমির শিথিল মৃত্তিকা পাইলে ত কথাই নাই, প্রভূত পরিমাণে তথাকার মৃত্তিকা দূরে লইয়া ফেলিবে। চৈত্র বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় এই চারি মাসে গঙ্গার জলে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কর্দ্দম থাকে। কলিকাতার নিকট দেখা গিয়াছে যে, ঐ চারি মাসে ১০ মণ জল হইতে গড়ে প্রায় ১ সের কর্দ্দম পাওয়া যায়। বায়ু, বাতাস, জীব প্রভৃতি সকলে ভূ-পৃষ্ঠ শিথিল করিয়া বৃষ্টির সহিত ক্ষয়সাধন-কার্য্যে তৎপর রহিয়াছে। ক্রমান্বয়ে উহাদিগের কার্য্য বিচার করা যাইতেছে।

৬১। **বায়ু দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়।** প্রথম অনুচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে যে, বায়ুতে অঙ্গারকাম্ল নামক একটি গ্যাস বিদ্যমান আছে। ঐ গ্যাস জলের সহিত মিশিতে পারে। বৃষ্টি পতিত হইবার সময় উহা বায়ু ভেদ করিয়া আইসে। তখন কিয়দংশ অঙ্গারকাম্ল-গ্যাস ঐ বৃষ্টিজলে মিশ্রিত হইয়া যায়। বিশুদ্ধ জল চূর্ণময় প্রস্তরকে দ্রবীভূত করিতে পারে না, কিন্তু এই গ্যাসমিশ্রিত জল উক্ত প্রস্তর গলাইতে পারে। পৃথিবীর অনেক স্থল শুদ্ধ ঐরূপ মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। অতএব প্রতীতি হইবে যে, ঐ স্থলে বৃষ্টি হইলে তথাকার ভূমি শিথিল হইয়া পড়িবে এবং তখন বৃষ্টিজল তাহার ক্ষয়সাধন করিয়া তত্রত্য ভূমিকে নিম্ন করিয়া ফেলিবে।

বায়ুর অম্লজনক-গ্যাসও ক্ষয়সাধন-কার্য্যে অল্প সহায়তা করিতেছে না। উহার কার্য্যের একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। ভূমিতে লৌহনির্ম্মিত দ্রব্যাদি রাখিলে তাহাতে মড়িচা পতিত হইতে সকলেই দেখিয়াছেন। মড়িচা পড়িবার কারণ লৌহের সহিত অম্লজনক-গ্যাসের সংযোগ। গোটা লৌহটিকে দূরে টানিয়া লইবার ক্ষমতা হয়তঃ বৃষ্টি-

জলের না হইতে পারে, কিন্তু বায়ু তাহাকে সূক্ষ্ম মড়িচায় পরিণত করিয়া দিলে, তখন অনায়াসে তাহা দূরীভূত হয়। পৃথিবীর স্থানে স্থানে লৌহময় প্রস্তর আছে। তথাকার ভূমি এইরূপে অনায়াসে ক্ষয়িত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন আরও বহুপ্রকার দ্রব্যের সহিত মিলিত হইয়া এই দুইটি গ্যাস ক্ষয়কার্য্যে নিরন্তর সহায়তা করিতেছে।

৬২। নদীদ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়। জল বৃষ্টিরূপে ও অঙ্গারকাম্ল ও অম্লজনক গ্যাসের সহিত মিশ্রিত হইয়া যাহা ক্ষয় করিতেছে, নদী তাহা বহন করিয়া স্থানান্তরে ফেলিতেছে। এইরূপে যে প্রভূত পরিমাণে মৃত্তিকা নদীদ্বারা দূরে আনীত হইতে পারে, তাহা আপাততঃ মনে হয় না। এক গঙ্গানদী দ্বারা প্রতিবৎসর কত অপরিমেয় মৃত্তিকা এইরূপে স্থানান্তরিত হইতেছে, তাহা ভাবিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। গঙ্গানদী দ্বারা কত পলি বাহিত হয়, তাহা গাজীপুরের নিকট স্থির করা গিয়াছিল। তাহাতে দেখা যায় যে, কেবল ৪ মাস বর্ষাতে গঙ্গানদী ৯,০০,০০,০০,০০০ নয়অর্ব্বুদ মণ পলি বহন করিয়া আনিতেছে। গাজীপুরের উত্তরপশ্চিমে যে সকল স্থান হইতে জল আসিয়া গঙ্গার কলেবর সাধিত করিতেছে, তাহার আয়তন প্রায় ১,৪৩,২২০ বর্গ মাইল। ঐ সমস্ত স্থান হইতে প্রতিবৎসর ঐ হারে মৃত্তিকা ধৌত হইয়া আসিলে, ঐ স্থান ১,১৪৬ বৎসরে এক ফুট নিম্ন হইবে। মোটামুটি ১,০০০ বৎসরে ১ ফুট নিম্ন হইবে ধরিলে, ২,০০০ বৎসরে ২ ফুট, ৫,০০০ বৎসরে ৫ ফুট অর্থাৎ মানুষ যত উচ্চ, তত নিম্ন হইয়া পড়িবে। অবশ্য, দুই হাজার কি পাঁচ হাজার বৎসর কাল পৃথিবীর বয়ঃক্রমের পক্ষে এক মুহূর্ত্ত সময়ও নহে। এইরূপে বরাবর যদি ভূমির পৃষ্ঠদেশের ক্ষয় হয়, তবে দেখ, কালক্রমে হিমালয়ের ন্যায় উচ্চ পর্ব্বতাদিও বঙ্গদেশের ন্যায় নিম্নভূমিতে পরিণত হইতে পারিবে,

তাহার কোন সন্দেহ নাই। ব্রহ্মপুত্রনদ গঙ্গার প্রায় দ্বিগুণ পলি বহন করিতেছে। আরও কত কত নদী এইরূপ পলি আনয়ন অরিতেছে। তবেই দেখ, কত অল্পে অল্পে কত বড় বিস্তীর্ণ ভূভাগের উচ্চ স্থান নিম্ন হইয়া পড়িতেছে। আমরা পরে দেখিব, আবার কত অসংখ্য অসংখ্য বিস্তীর্ণ ভূভাগ ঐ জলবাহিত পলিদ্বারাই ক্রমশঃ উচ্চ হইতেছে।

নদী কেবল ক্ষয়িত ভূমির মৃত্তিকাদি বহন করিয়াই ক্ষান্ত নহে। নদী স্রোতদ্বারা তাহার উপকূল ভাঙ্গিতে অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। বন্যা না হইলেও, এবং স্রোত প্রবল না থাকিলেও, সাধারণতঃ উহার যেরূপ স্রোত থাকে, তদ্দ্বারাও ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়কার্য্যসাধন নিতান্ত অল্প হয় না। নিতান্ত মৃদু স্রোতদ্বারা ছোট ছোট বালুকা হইতে প্রবল স্রোতে ছোট ছোট নুড়ী চালিত হইয়া থাকে। ঐ বালুকা এবং ছোট ছোট নুড়ী নদীগর্ভে ঘর্ষণ করিতে করিতে চালিত হয়। মনে কর, যদি কোন কঠিন শিলাকে বালুকা এবং নুড়ী দ্বারা ক্রমাগত ঘসা যায়, তাহা হইলে সেই শিলার কি ক্ষয় হইবে না? বাস্তবিক, মৃদু হইতে প্রবল স্রোতদ্বারা ছোট বড় নুড়ী সর্ব্বদা প্রায় সকল নদীদ্বারা চালিত হইতেছে। নদীগর্ভে যে মসৃণ ও কোণভগ্ন নুড়ী, কাঁকর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা যখন ভগ্ন হয়, তখন কোণবিশিষ্ট ছিল। বৃষ্টিজল দ্বারাই হউক, কিম্বা প্রবল ঝড়েই হউক কিম্বা তুষারপাতবশতঃই হউক, ছোট বড় শিলাখণ্ড পাহাড় পর্ব্বত

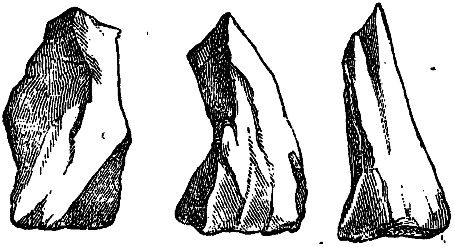

১১ চিত্র। ভগ্ন কোণবিশিষ্ট শিলাখণ্ড।

হইতে প্রায়ই বিচ্যুত হইয়া পড়ে। তখন তাহারা কোণবিশিষ্ট থাকে (১১ চিত্র)। পরে গড়াইতে গড়াইতে পরস্পর পরস্পরকে ঘর্ষণ করিয়া ও তৎসঙ্গেসঙ্গে নদীগর্ভ ঘর্ষণদ্বারা ক্ষয় করিয়া অবশেষে মসৃণ নুড়ীতে পরিণত হয় (১২ চিত্র)। প্রস্তরের কোণগুলি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া অবশেষে বালুকাবৎ সূক্ষ্ম হইয়া পড়ে। নদীর বালি, পলি, কর্দ্দম যেখানে দেখা যায়, তথায় উৎপন্ন হয় না। উহারা দূরদেশের প্রস্তরের চূর্ণকণিকা ভিন্ন কিছুই নহে।

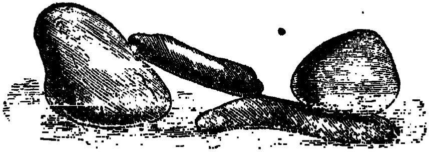
১২ চিত্র। কোণবিশিষ্ট শিলাখণ্ড মসৃণ নুড়ীতে পরিণত হইয়াছে।

তবেই দেখ, অদৃশ্যভাবে অবিশ্রান্ত নদী আপন স্রোতদ্বারা ভূমি ক্ষয় করিতেছে। কিন্তু বন্যার সময় স্রোত প্রবল হইলে উহার ক্ষয়কারী শক্তি কত বর্দ্ধিত হয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। তখন কত কত ঘরদ্বার বিভগ্ন, বৃক্ষাদি উৎপাটিত, কত প্রভূত পরিমাণে মৃত্তিকা, বালুকা চালিত হইতে থাকে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। সন ১২৭৩ সালে সিন্ধুদেশে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২০ ইঞ্চ বা কিঞ্চিদধিক এক হাত বৃষ্টি হয়। তাহাতে মুলিয়ার নামক নদী বর্দ্ধিত হইয়া করাচির ৮ ক্রোশ দক্ষিণে লৌহ-নির্ম্মিত পোল ভাঙ্গিয়া দেয়, এবং ২,২৪০ মণ ভারি একটা লৌহ-কড়ি এক ক্রোশ দূরে বালুকার মধ্যে প্রোথিত করিয়া ফেলে। আমাদের বঙ্গদেশের পদ্মানদী দ্বারা প্রতি বৎসর উপকূলের কত কত বিস্তীর্ণ গ্রাম নগরসকল নদীগর্ভে বিলীন হইতেছে, তাহা পূর্ব্ববঙ্গবাসী ব্যক্তি-মাত্রই অবগত আছেন। আজ ১৭ বৎসর হইল গোয়ালন্দের রেলওয়ে

ষ্টেষণ নূতন নির্ম্মিত হয়। এই সময়ের মধ্যে পদ্মা তাহার কূলদেশ এতদূর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে যে, ঐ ষ্টেষণটি সরাইয়া আনিতে আনিতে উহা ৭ মাইল দূরবর্ত্তী রাজবাড়ী নামক পরবর্ত্তী ষ্টেষণের নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। বর্দ্ধমানের দামোদর ও উড়িষ্যার মহানদী বন্যার পরাক্রমের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ।

৬৩। **তুষারদ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়।** বঙ্গদেশে জলের তুষাররূপ দেখিতে পাই না। এজন্য তদ্দ্বারা যে ভূ-পৃষ্ঠ ক্ষয়িত হইতেছে, তাহাও সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি না। কিন্তু ইংলণ্ডপ্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে ও হিমালয়প্রভৃতি উচ্চ পার্ব্বত্যপ্রদেশে উহাদ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়কার্য্য প্রবলরূপে সাধিত হইতেছে। জল জমিয়া বরফ হইলে, তাহার আয়তনের বৃদ্ধি[১] হয়। আয়তন বৃদ্ধি হইবার সময় তাহা এত বল প্রয়োগ করে যে, লৌহনির্ম্মিত বোতল জলপূর্ণ করিয়া ঐ বোতলের জল জমাইয়া বরফ করিলে, উহা খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যায়। পার্ব্বত্যপ্রদেশে ছোট বড় ফাঠ প্রায়ই থাকে। বৃষ্টির জল ঐ ফাঠের মধ্যে গিয়া একত্রিত হয়। পরে শৈত্যে জমিয়া বরফ হইবার সময় পার্শ্বে এত চাপ প্রয়োগ করে যে, পার্শ্বস্থিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাসকল বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তখন ঐ সকল বিচ্ছিন্ন শিলাখণ্ড বৃষ্টিজলের স্রোত ও বাতাস দ্বারা দূরদেশে আনীত হয়। এইরূপে দারজিলিং, সিমলা প্রভৃতি পার্ব্বত্যপ্রদেশে প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া সময়ে সময়ে রাস্তা ঘাট একবারে বন্ধ হইয়া যায়।

৬৪। **বাতাসদ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়।** বাতাসও ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয় করিতেছে। বায়ুতে ভাসমান ধূলিকণিকা, বালুকা প্রভৃতি প্রবল বাতাসে যে দূরে চালিত হয়, তাহা কাহাকেও বলিতে হইবে না।

---

[১] সরল পদার্থ-বিজ্ঞান ৮০ প্রকরণ।

বাতাসের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি বালুকাময় মরুভূমিতে সম্যক্ দৃষ্ট হয়। একস্থানের বালুকা অন্যত্র চালনা ভিন্ন, ঐ বালুকার ঘর্ষণে কঠিনকঠিন প্রস্তরসকল ক্ষয়িত হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন, বড় বড় নদীতে ও সমুদ্রে প্রবল বাতাস প্রকাণ্ড তরঙ্গ উৎপাদন করিয়া, উহাদিগের উপকূল তরঙ্গাভিঘাতে বিনষ্ট করিবার সহায়তা করে।

৬৫। জীবদ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়। অনেকে আপাততঃ ভাবিতে পারেন যে, জীববর্গ আবার কেমন করিয়া ভূ-পৃষ্ঠ ক্ষয়কার্য্যে যোগ দিতেছে। কিন্তু কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, খরগোস, শৃগাল, ছুঁচা, কেঁচো প্রভৃতি প্রাণীবর্গ মৃত্তিকায় গর্ত্ত খনন করিয়া উহাকে শিথিল করে। পরে বৃষ্টিজলে ধৌত হইয়া তথাকার মৃত্তিকা স্থানান্তরিত হয়। প্রাণী ব্যতীত, বৃক্ষাদি তাহাদিগের মূল ফাট ও মৃত্তিকার মধ্যে চালিত করিয়া উহাকে শিথিল করিয়া দেয়।

আমরা পূর্ব্ব কয়েক পৃষ্ঠায় ভূপৃষ্ঠ-ক্ষয়কারী কয়েকটির কার্য্য দেখিলাম। দিবা রাত্রি অবিরত ভূ-পৃষ্ঠ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। এক্ষণে দেখা যাউক, নদী বৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা ভূ-ভাগ ক্ষয়িত ব্যতীত অন্য ভূ-ভাগ নির্ম্মিত হইতেছে কি না।

৬৬। নদীদ্বারা ভূভাগ-নির্ম্মাণ। বৃষ্টি হইলে দেখা যায় যে, ছোট ছোট নুড়ী, ইঁট বৃষ্টিজলের স্রোতে গড়াইতে গড়াইতে নালার মোহনায় গিয়া একত্রিত হয়। কিন্তু উহাদিগের মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বালুকা, কর্দ্দম প্রভৃতি জলের স্রোতে ভাসমান থাকিয়া নালা হইতে অনেক দূরে আনীত হয়। কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ স্রোতবেগ হ্রাস হইলে প্রথমতঃ উহাদিগের মধ্যে মোটা মোটা দ্রব্যগুলি ভূমিতে পতিত হয়, এবং অবশেষে সরু সরু বালুকা ও কর্দ্দম থিতাইয়া পড়ে। এই বিষয়টি নিম্নলিখিত পরীক্ষাটি করিলে বেশ বুঝা যাইবে। এক

গেলাস জলে বালুকা ও কর্দ্দম মিশ্রিত কর। দেখ যে, গেলাসের জল স্থির হইলে অগ্রে বালুকার একস্তর পতিত হইয়া অবশেষে কর্দ্দমের স্তর থিতাইয়া পড়িবে (১৩ চিত্র)। প্রদেশের ঢালুতার অল্পতা-বশতঃই হউক কিম্বা অপর কোন প্রতিবন্ধক পাইলে, ঠিক ঐ প্রকারে নদীবাহিত পলিও তথায় থিতাইয়া পড়ে। পরীক্ষার গেলাসের জল আলোড়ন করিলে, বালুকা ও কর্দ্দম থিতাইতে অনেক বিলম্ব হইবে, এমন কি, আদৌ গেলাসের তলে সঞ্চিত হইবে না। প্রবল বন্যার সময় দামোদর, মহানদী, পদ্মা প্রভৃতি বর্দ্ধিতকলেবর হইয়া পরিতোবর্ত্তী গ্রামসমূহ যখন জলদ্বারা প্লাবিত করে, তখন নদীর উপকূলের উপর তাহার স্রোতবেগ কম হওয়াতে, সমস্ত পলি থিতাইয়া তাহার কূলদেশ ক্রমশঃ উচ্চ করিতে থাকে। ঘটনাক্রমে ঐ জল কোন বিলে গিয়া পড়িলে, তথায় তাহার গতি বন্ধ হইয়া দুই এক দিবসের মধ্যে সমস্ত পলি ঐ বিলে নিক্ষিপ্ত হইয়া উহাকে কিঞ্চিৎ উচ্চ করিবে। নদীগর্ভের মধ্যস্থল অপেক্ষা তাহার কূলের নিকট স্রোতের বেগ কম, এজন্য কূলদেশ পলিপতনবশতঃ উচ্চ হইতে থাকে। এইরূপে বৎসর বৎসর পলিপতন জন্য কূলদেশ এত উচ্চ হইয়া উঠিতে পারে যে, তখন নদী জলদ্বারা তাহা আর প্লাবিত হইবে না। এইরূপে ব্রহ্মপুত্রনদ দ্বারা বাহিত পলিদ্বারা শ্রীহট্টের বিখ্যাত জলাভূমি ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। দামোদর নদের পার্শ্বস্থ ভূমি পলিপতনবশতঃ উচ্চ হইয়া উর্ব্বরা ও উচ্চভূমিতে (ডাঙ্গা) পরিণত হইতেছে। যে কোন নদী দেখিবে, তদ্দ্বারাই অল্পাধিক পরিমাণে বহুদূরস্থিত পর্ব্বতাদি হইতে মৃত্তিকা আনীত হইয়া তাহার পার্শ্বদেশ ও মোহানা উচ্চ হইতেছে। কালক্রমে

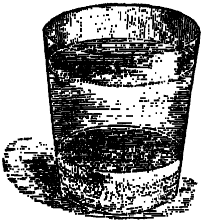
১৩ চিত্র।

ক্রমাগত পলিপতনবশতঃ পার্শ্বদেশ জলপ্লাবন-সীমার ঊর্দ্ধে উঠিবে। তখন নদীবাহিত পলি আর চারিদিকে ছড়াইয়া না পড়াতে, নদীগর্ভে অল্পে অল্পে সঞ্চিত হইবে। অবশেষে নদীগর্ভই উচ্চ হইয়া উঠিবে। তখন নদীকে নূতন পথ খুঁজিয়া লইতে হইবে, নচেৎ সমস্ত জলরাশির নিকাশ হইবে না। নদীপার্শ্বে বাঁধ বাঁধিলেও ঠিক এই প্রকার ফল ঘটিয়া থাকে। উচ্চ বাঁধ থাকাতে নদীজল চারিদিকে ব্যাপ্ত হইতে পারে না, তখন পলি নদীগর্ভে অল্পে অল্পে সঞ্চিত হইয়া উহাকে উচ্চ করিতে থাকে। সুতরাং বাঁধও উচ্চ করিবার আবশ্যক হয়। অবশেষে বাঁধের অপর পার্শ্বের গ্রাম, নগর প্রভৃতি যাহাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বাঁধ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাদিগের অপেক্ষা নদীগর্ভ ও সুতরাং জল উচ্চ হইয়া পড়িয়া ঐ সকল গ্রাম, নগরের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভীতির কারণ হয়। বর্দ্ধমান নগর ঠিক দামোদরের উপর। দামোদরনদের জলপ্লাবন হইতে বর্দ্ধমান রক্ষা করিবার নিমিত্ত নদের পার্শ্বে বাঁধ আছে। কিন্তু কালক্রমে দামোদর নদগর্ভে পলিপতনবশতঃ উহা এক্ষণে বর্দ্ধমানের সমান উচ্চ হইয়াছে। এখন যদি বাঁধ একবার ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে সমস্ত বর্দ্ধমান সহর জলরাশিতে নিমগ্ন হইয়া বিনষ্ট হইবে। তবেই দেখ, নদীর বাঁধে অধিকাংশ স্থলে আপাততঃ উপকার হইতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে ঐ বাঁধই কালস্বরূপ হয়। কটকের নিকট মহানদীরও এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। ছোট বড় অধিকাংশ নদীতেই ইহা দেখা যায়। বাঁধ কাটাইয়া নিকটবর্ত্তী বিলে ঐ সকল নদীর জল চালিত করিবার ব্যবস্থা করিলে, অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা। নদীগর্ভে ভগ্ন নৌকা, উৎপাটিত বৃক্ষদ্বারা স্রোতবেগ কম হইলে, তাহার চারিদিকে পলি পতিত হইয়া ক্রমশঃ নদীর চর উৎপন্ন হয়। ত্রিবেণী, চুঁচুড়া

ও শান্তিপুরের চর ভাগীরথীতে এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। চুঁচুড়ার চর ৫০ বৎসরের মধ্যে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

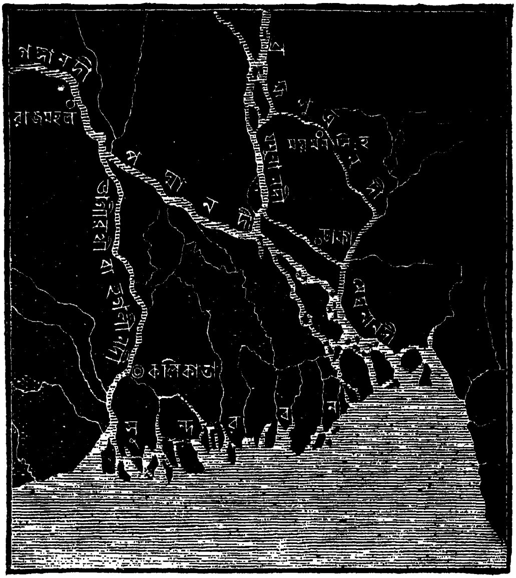
গঙ্গা নদী
রাজমহল
পদ্মা নদী
ভাগীরথী বা হুগলী নদী
কলিকাতা
ব্রহ্মপুত্র
ময়মনসিংহ
যমুনা নদী
ঢাকা
মেঘনা নদী
সুন্দরবন

৫ মানচিত্র। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের ত্রিকোণমণ্ডল ভূমি।

নদীবাহিত পলির কিয়দংশ নদীর পার্শ্বদেশে পতিত হইয়া উহা উন্নত করিতে থাকে। কিন্তু অধিকাংশ পলি নদীর ও সমুদ্রের মিলনস্থলে পতিত হয়। তথায় সমুদ্রের স্রোত প্রবল না হইলে, সমস্ত পলিই তথায় সঞ্চিত হইয়া সমুদ্রগর্ভ ক্রমশঃ পূর্ণ করিতে থাকিবে। অবশ্য, সমুদ্রগর্ভকে ভূমি করা দুই এক বৎসরে সম্পন্ন হইবে না। কিন্তু ক্রমাগত বর্ষে বর্ষে, যুগে যুগে পলি পতিত হইতে থাকিলে, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র দ্বারা প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশ এইরূপে উৎপন্ন হওয়া বিচিত্র নহে। এইরূপে পলিপতনদ্বারা গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মোহানার নিকট

কত নূতন দ্বীপ নির্ম্মিত হইতেছে। সুন্দরবন নামক বিস্তীর্ণ ভূভাগ ঐ দুই নদীর পলিপতন দ্বারা ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া ভবিষ্যতে মনুষ্যাদির বাসযোগ্য হইবে।

নদীর মোহানার নিকট পলিপতন জন্য উচ্চ হওয়াতে, উহার স্রোতের বেগ কম হইতে থাকে। এজন্য নদীর সমস্ত জল পূর্ব্বের প্রণালী দিয়া প্রবাহিত হইয়া শেষ হইতে পারে না। তখন তাহা বিভিন্ন পথে বিভক্ত হইয়া সাগরে উপনীত হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে মোহানায় নূতন ভূ-ভাগ প্রস্তুত হইয়া ত্রিকোণাকার ভূমিতে পরিণত হয়। এইরূপে উৎপন্ন ত্রিকোণাকার ভূমিকে নদীর ত্রিকোণমণ্ডলভূমি বলে। উপরের গঙ্গার ও ব্রহ্মপুত্রের ত্রিকোণমণ্ডলভূমি দেখান গেল। ঐ চিত্র হইতে অনায়াসে বুঝা যাইবে যে, বঙ্গদেশের অধিকাংশ ঐ ত্রিকোণমণ্ডলভূমিতে অবস্থিত। কোন প্রধান নদীর মোহানা হইতে উহার উৎপত্তি-স্থলাভিমুখে গমন করিলে, উহার দুইপার্শ্বে ক্রমাগত অপরাপর নদী মিলিত হইতে দেখা যায়। এই সকল নদীকে করদ নদী বলে। যেস্থানের জলরাশি ঐ নদীদ্বারা বাহিত হয়, নদীর উভয় পার্শ্বের সেই স্থানকে সেই নদীর অববাহিকা বলে। পুনশ্চ, নদীর

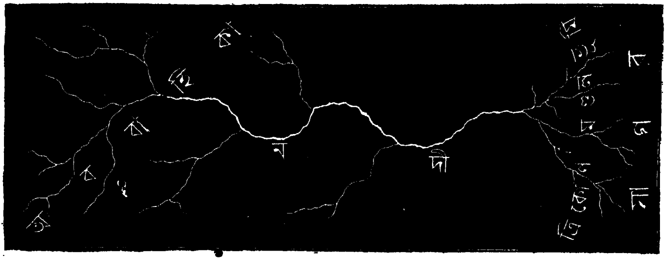

১৪ চিত্র। নদীর অববাহিকা ও ত্রিকোণমণ্ডল ভূমি।

মোহানার দিকে গমন করিলে উহাকে অনেকগুলি শাখানদীতে বিভক্ত হইতে দেখা যায়। যেস্থান হইতে বিভক্ত হয়, তথা হইতে সাগর পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানটি ঐ নদীর ত্রিকোণমণ্ডলভূমি। উপরের চিত্রদ্বারা এবিষয়টি স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

৬৭। **ভূ-পৃষ্ঠের উপর প্রস্রবণের কার্য্য।** পূর্ব্বপ্রকরণে বৃষ্টি ও নদী জলদ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে নূতন ভূ-ভাগের উৎপত্তির বিষয় বিবৃত হইয়াছে। এক দিকে ধ্বংস, অপর দিকে উৎপত্তি। তবে মনুষ্যাদি পশু-পতঙ্গ ও বৃক্ষালতাদির কেবল প্রাণধারণ জন্য জল ক্রমাগত রূপ পরিবর্ত্তন করিতেছে না। উহা নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া বৃষ্টি-রূপে ভূমিকে যেমন শস্যশ্যামলা করিতেছে, অপরদিকে সেই নিয়মদ্বারা আমাদিগের পৃথিবীর উচ্চস্থান নিম্ন এবং নিম্ন স্থান উচ্চ করিতেছে। কিন্তু বৃষ্টি সদা সর্ব্বদা হয় না, অথচ গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র মহানদী প্রভৃতি নদী সকল অবিশ্রান্ত সমুদ্রে জল ঢালিতেছে। বর্ষাকালে ঐ সকল নদীর কলেবর বর্দ্ধিত হয় মাত্র, কিন্তু কি শীতকাল আর কি গ্রীষ্মকাল সকল সময়ই অল্লাধিক পরিমাণে জলরাশি সমুদ্রে গিয়া পতিত হইতেছে। এত জল উহারা কোথা হইতে পাইতেছে?

পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে যে, বৃষ্টিজলের কিয়দংশমাত্র (বোধহয় বৃষ্টি জলের একতৃতীয়াংশ) নদ নদীদ্বারা সমুদ্রে আনীত হয়, কিয়দংশ বৃক্ষাদি জীবদ্বারা ব্যবহৃত হয়, কিয়দংশ বাষ্পাকারে পুনর্ব্বার বায়ুতে মিশিয়া যায়। কিন্তু অবশিষ্টাংশ ভূমির নীচে চলিয়া যায়। বালুকাময় স্থানে জল ঢালিলে, তাহা বালুকার নীচে চলিয়া যায়। আর কোন ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ শুষ্ক দেখাইলেও তাহার কিঞ্চিৎ নিম্নের মৃত্তিকা জলসিক্ত দেখা যায়। এমন কি, এইজন্যই খননদ্বারা পুষ্করিণী কূপাদিতে জল পাওয়া যায়। পাথুরিয়া কয়লার ও অন্যান্য খনিজ

দ্রব্যের জন্য গভীর খনি খাদ করিলে, ঐ খনিতে এত জল সঞ্চিত হয় যে, তাহা এক দিবস উত্তোলন না করিলে সমস্ত খনি জলপূর্ণ হইয়া যায়। এই সকল দ্বারা নিশ্চয় জানা যাইতেছে যে, কিয়দংশ বৃষ্টি-জল নিম্নে গিয়া সঞ্চিত হয়।

ভূ-পৃষ্ঠ কঠিন শিলাময় হইলে হয়তঃ সমস্ত বৃষ্টি-জল নিম্নে প্রবেশ করিতে না পারিয়া অধিকাংশ নদী দ্বারা বাহিত হইবে। তদ্রূপ, আটাল (এঁটেল) মৃত্তিকার উপর পড়িলেও, তাহার ভিতর দিয়া জল যাইতে পারে না। এই সকলকে জলের দুষ্প্রবেশ্য স্তর বলে। আর বালুকা, বালুকাময় প্রস্তরাদি, যাহাদিগের ভিতর দিয়া জল চালিত হইতে পারে, তাহাদিগকে জলের প্রবেশ্য স্তর বলে।

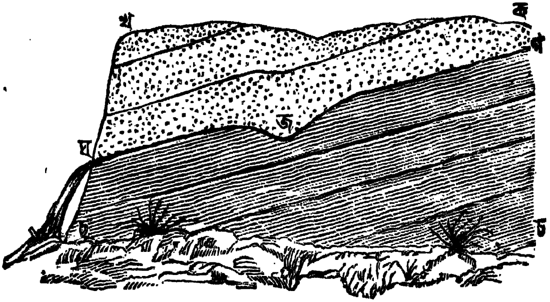

১৫ চিত্র। ক খ গ ঘ জলের কয়েকটি প্রবেশ্য স্তর গ ঘ চ ছ কয়েকটি দুষ্প্রবেশ্য স্তরের উপর রহিয়াছে। গ ঘ জ স্থানে জল সঞ্চিত হইয়া ঘ-র নিকট নির্গত হইতেছে।

মনে কর (১৫ চিত্র) জলের দুষ্প্রবেশ্য কোন স্তরের উপর কোন প্রবেশ্য স্তর আছে। তথায় বৃষ্টি হইলে, বালুকা প্রভৃতি প্রবেশ্য স্তরের মধ্য দিয়া জল দুষ্প্রবেশ্য স্তরের উপরে সঞ্চিত হইবে। যতই জল হউক, সমস্তই তথায় সঞ্চিত থাকিয়া নিম্নদিকে যাইবার কোন রূপ

পথ পাইলেই চলিয়া যাইবে। কোন নদীর গর্ভ ঐ স্থান দিয়া গিয়া উপরের প্রবেশ্য স্তরটিকে কাটিয়া দিলে, দুষ্প্রবেশ্য স্তরে সঞ্চিত সমস্ত জল নদীগর্ভে নিস্থত হইবে। ভূ-গর্ভ হইতে জলধারা উপরে উঠিলে,

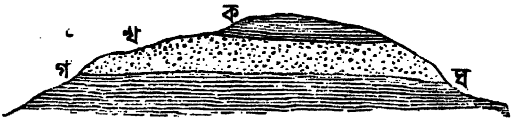

১৬ চিত্র।

প্রস্রবণ উৎপন্ন হয়। কিন্তু সকলের উপরের স্তরটি (১৬ চিত্র) জলের দুষ্প্রবেশ্য (ক) এবং তাহার নিম্নের স্তরটি (খ) বালুকাময় হইয়া জলের প্রবেশ্য হইতে পারে। তখন খ-র উপর পতিত বৃষ্টিজল উহার নিম্নের দুষ্প্রবেশ্য স্তরের উপর গ ঘ স্থানে সঞ্চিত হইবে। এতদ্ভিন্ন, অনেক স্থলে আটাল মৃত্তিকা ফাটিয়া যায়, এবং কঠিন শিলাময় স্থানেও সরু মোটা ফাট দেখা যায়। এরূপ স্থলে, বৃষ্টির জল ঐ সকল ফাট দিয়া যাইয়া ভূ-মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। অবশেষে হয়তঃ অনেক নিম্নে গিয়া কোন দুষ্প্রবেশ্য স্তরের উপর প্রবেশ্য স্তর পাইয়া, প্রবেশ্য স্তরে সঞ্চিত হয়। এই কারণ নিমিত্ত কূপাদি খনন করিলে দেখা যায় যে, হয়তঃ প্রথমতঃ একটি বালুকা কঙ্করময় প্রবেশ্য স্তর, পরে একটি আটাল মৃত্তিকার দুষ্প্রবেশ্য স্তর, তাহার নিম্নে একটি প্রবেশ্য স্তর অন্য দুষ্প্রবেশ্য স্তরের উপরে রহিয়াছে। বর্ষাকালে নিম্নস্তর হইতে উপরের স্তর পর্য্যন্ত জলপূর্ণ থাকে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে হয়তঃ উপরের প্রবেশ্যস্তরের জল ফুরাইয়া যাওয়াতে, নিম্নের স্তরের নিকট জল পাওয়া যায়। কূপের জল তুলিয়া ফেল, আবার ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিক হইতে বালুকা কঙ্কর ভেদ করিয়া জল নিস্থত হইয়া কূপে সঞ্চিত হইবে।

অনেক প্রস্রবণের জল উষ্ণ দেখা যায়। ইহার কারণ ও বিবরণ পরে দেখা যাইবে। প্রায় যাবতীয় প্রস্রবণের জলে বহুবিধ ধাতব পদার্থ দ্রবীভূত থাকে। এজন্য কূপাদির জল অনেক সময় বিস্বাদ বোধ হয়।

তবেই দেখ, নদীদ্বারা যেমন ভূ-পৃষ্ঠের মৃত্তিকা স্থানান্তরে নীত হইয়া নূতন ভূভাগের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ প্রস্রবণ দ্বারা ভূ-গর্ভের মৃত্তিকা জলে মিশ্রিত অবস্থায় উপরে আনীত হইয়া দূরে চালিত হইতেছে। ভূ-গর্ভ হইতে উত্থিত প্রস্রবণের জলই নদীসমূহের প্রাণ। কিন্তু ঐ জলও সেই বৃষ্টিজল; কেবলমাত্র কিছুকাল ভূ-গর্ভে বাস করিয়া উহা ধাতুদ্রব্য, মৃত্তিকা লবণ প্রভৃতি দ্রব করিয়া ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিতেছে।

কিন্তু এস্থলে বলা আবশ্যক যে, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধুর ন্যায় নদী সকল, যাহারা হিমালয়ের ন্যায় তুষারাচ্ছন্ন প্রদেশ হইতে বহির্গত হয়, তাহারা গ্রীষ্মকালে সূর্য্যোত্তাপে তুষার-গলনবশতঃ অধিকাংশ জল প্রাপ্ত হয়। এমন কি, ঐ রূপে তুষার দ্রবীভূত হইয়া সময়ে সময়ে সিন্ধুনদে প্রবল বন্যার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

৬৮। সংক্ষিপ্তসার। এই অনুচ্ছেদে আমরা দেখিলাম যে, জল সমুদ্র হইতে বাষ্পাকারে শূন্যে উত্থিত হইয়া বাতাসদ্বারা চালিত হইয়া নানা দেশে বৃষ্টিরূপে পুনরায় ভূ-পৃষ্ঠে উপনীত হয়। বৃষ্টি-জল আবার গড়াইতে গড়াইতে সমুদ্রে গিয়া সমুদ্রকে ক্ষীণ হইতে দেয় না। কিন্তু এইরূপে অবিশ্রান্ত রূপ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জল দ্বারা উচ্চ উচ্চ ভূ-পৃষ্ঠ ক্ষয়িত হইয়া দূরে নূতন ভূভাগের উৎপত্তি হইতেছে। বায়ুর অঙ্গারকাম্ল ও অম্লজনক গ্যাস, বাতাস, নদী, এমন কি, জীবগণও ভূমির ক্ষয় কার্য্যে সহায়তা করিতেছে। কিন্তু যেমন একদিকে ভূমি ক্ষয় হইতেছে, অপর দিকে নূতন ভূমি উৎপন্ন হইতেছে। পূর্ব্বে যাহা বিল বা সমুদ্রের অংশ ছিল, তাহা নদী বাহিত পলিদ্বারা পূর্ণ হইয়া

নূতন ভূমিতে পরিণত হইতেছে। এইরূপ কিছুকাল জল কার্য্য করিতে পাইলে, পরিশেষে হিমালয়ের ন্যায়, অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালাও নিম্ন প্রান্তরে এবং বঙ্গসাগরের ন্যায় সাগরও পূর্ণ হইয়া নূতন ভূ-ভাগে, পরিণত হইতে পারে। নদীদ্বারা জল অবিরত সমুদ্রে বাহিত হইতেছে। এই বিষয় আলোচনা করিতে করিতে ভূ-গর্ভ উত্থিত প্রস্রবণের উৎপত্তি দেখা গিয়াছে। এই সকল প্রস্রবণ না থাকিলে অধিকাংশ নদী গ্রীষ্ম-কালে শুষ্ক হইয়া যাইত। কিন্তু ঐ সকল প্রস্রবণও ভূমি ক্ষয় ও নির্ম্মাণ করিতেছে। ভূগর্ভে জল চালিত হওয়াতে নানাবিধ দ্রব্য তাহাতে মিশ্রিত হয়, পরে নদীতে পড়িয়া দূর দেশে নীত হইয়া নূতন ভূ-ভাগ উৎপত্তির সহায়তা করে।

তৃতীয় অধ্যায়।

সমুদ্র।

১ § সমুদ্রের প্রাকৃত অবস্থা।

৬৯। প্রথম অধ্যায়ে পৃথিবীর ভূ-ভাগের উপর পতিত বৃষ্টিজলের উৎপত্তি, প্রকৃতি, পরিণাম ও কার্য্য বর্ণিত হইয়াছে। তথায় উক্ত হইয়াছে যে, নদী সকল অবিশ্রান্ত সমুদ্রে জল ও পলি বহন করিতেছে। এক্ষণে দেখা যাউক সমুদ্রদ্বারা ভূ-ভাগের কি প্রকার পরিবর্ত্তন এবং কি প্রকার ক্ষয়-কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে।

আমাদের দেশের অনেকেরই সমুদ্রদর্শন ঘটে না। সমুদ্র বলিলেই এক প্রকাণ্ড দিগন্তব্যাপী অতলস্পর্শ জলরাশি মনে হয়। বাস্তবিক উহা পৃথিবীর দিগন্তব্যাপীই বটে। ভূ-পৃষ্ঠের নিম্নতম স্থান জলপূর্ণ হইয়া সমুদ্র নাম ধারণ করিয়াছে। যাহাকে আতলান্তিক, যাহাকে প্রশান্ত, যাহাকে ভারত, যাহাকে কুমেরু ও সুমেরু সমুদ্র বলে, তৎসমুদয় একটিমাত্র জলরাশি, আমাদিগের সুবিধার জন্য ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া গিয়াছে। অনেক স্থলে যেমন একই নদীর স্থানবিশেষে বিশেষ বিশেষ নাম হয়; পৃথিবীর সমুদ্ররূপ জলরাশিরও তদ্রূপ। যে নদীকে বঙ্গদেশে ও আসামে ব্রহ্মপুত্র বলা যায়, হিমালয়ের উত্তর তিব্বতে সাঙ্গপো এবং সাগর-সঙ্গমের নিকট গঙ্গার সহিত যুক্ত হইয়া মেঘনা তাহারই নাম হইয়াছে।

৭০। **সমুদ্রজলের লবণাদি উপকরণ।** পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সমুদ্রে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদীসকল অবিশ্রান্ত পলি ও জল বহন করিতেছে। এজন্য নদীর মোহানার নিকট সমুদ্রের জল

কর্দ্দমাক্ত ঘোলা দেখা যায়। কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে কয়েক মাইল চলিয়া গেলেই সমুদ্রজল আর কর্দ্দমাক্ত দেখা যায় না। বঙ্গসাগরের জল গভীর নীলবর্ণ; কিন্তু কোন কোন সমুদ্রের জল লোহিত, পীত দৃষ্ট হয়।

সমুদ্রজল নিতান্ত লবণাক্ত। স্বভাবতঃ যত রকম জল দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে বৃষ্টিজলই বিশুদ্ধ এবং খনিজ-জল ও সমুদ্রের জল সর্ব্বাপেক্ষা অবিশুদ্ধ। কোন জলে লবণাদি কঠিনপদার্থ দ্রবীভূত আছে কি না, তাহা অনায়াসে নিরূপণ করিতে পারা যায়। জলে কিঞ্চিৎ লবণ মিশ্রিত করিয়া, একখণ্ড পরিষ্কৃত পরকলায় উহার একবিন্দু রাখিয়া দিলে, জল শুকাইয়া গেলে পরকলায় একটা দাগ দেখিবে। কিন্তু কোন বিশুদ্ধ জলের ফোঁটা রাখিলে, জল অদৃশ্য হইলে, পরকলায় কোনরূপ দাগ দেখা যাইবে না। সমুদ্র বা অপর কোন লবণাক্ত জল পরকলায় রাখিলে যে দাগ পড়ে, তাহা ঐ ঐ জলের মলা বা লবণাদি।

সমুদ্রজল বড় বড় পাত্রে রৌদ্রে রাখিয়া দিলে, জল শুকাইয়া পাত্রের তলে লবণ পাওয়া যায়। ঐ লবণ মৃত্তিকাময়, তজ্জন্য খাইতে বিস্বাদ লাগে। ঐ লবণকে 'করকচ' লবণ বলে। উড়িষ্যা,মাদ্রাজ প্রভৃতি সমুদ্র-কূলবাসীগণ ঐ করকচ লবণ সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকে।

সমুদ্রজলে খাইবার লবণ ব্যতীত অন্যান্য বহুপ্রকার দ্রব্য থাকে। উহাতে যে চূর্ণ আছে, তাহা অনায়াসে দেখা যায়। সমুদ্রে কত অসংখ্য প্রকার কড়ি, শঙ্খ, শম্বুক, ঝিনুক দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের খোলা পোড়াইয়া আমরা অনেক সময় চূণ প্রস্তুত করিয়া থাকি। ইহাতে জানা যায় যে, ঐ সকল সামুদ্রিক প্রাণী সমুদ্রজল হইতে চূণ বাহির করিয়া আপনাপন দেহাবরণ নির্ম্মাণ করে।

সকল সমুদ্রে সমান পরিমাণে লবণাদি কঠিন পদার্থ নাই। সাধারণতঃ, এক মণ সমুদ্র জল শুষ্ক করিলে প্রায় সাড়ে পাঁচ পোয়া

লবণ পাওয়া যায়। হিসাবদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সমুদ্রের সমস্ত জল শুকাইয়া লবণ বাহির করিলে, উহা এত অধিক হইবে যে, ভূ-পৃষ্ঠে ছড়াইয়া দিলে তদ্দারা প্রায় ২০।২২ হাত পুরু এক স্তর উৎপন্ন হইবে। সমুদ্রজলে লবণ মিশ্রিত থাকায়, নদীর অপেক্ষাকৃত খাঁটি ও হাল্কা জল উহার নীলজলের উপর ভাসিয়া বেড়ায়। এজন্য নদীর মোহানা পার হইয়াও সমুদ্রের জলে অনেকদূর পর্য্যন্ত নদীর ভাসমান শাদা জল স্পষ্ট দেখা যায়।

৭১। সমুদ্রজলের আলোক। রাত্রিকালে বঙ্গসাগরের জলে এক অনির্ব্বচনীয় আলোক দেখা যায়। জাহাজ-চালনায় জল আলোড়িত হইলে কিম্বা বড় বড় ঢেউ উঠিতে থাকিলে, গভীর নীলজল শাদা ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকের ন্যায় আলোকরাশিতে ব্যাপ্ত হয়। গলন্ত সজ্না গাছের আটার ন্যায় এক প্রকার ক্ষুদ্র কীটাণু সাগরজলে বাস করে। উহারা রাত্রিকালে জোনাকি-পোকার ন্যায় আলোক বিকীর্ণ করিয়া থাকে। বোধ হয় ঐ সকল কীটাণুর প্রস্ফুরন্ত আলোকই সমুদ্রজলের আলোকের কারণ। সমদ্রজলের ঢেউ তটে আসিয়া ভাঙ্গিবার সময় ঐ পোকাগুলির আলোক বেশ দেখা যায়।

৭২। সমুদ্রের গভীরতা। সাধারণতঃ, সমুদ্র অতলস্পর্শ মনে হইলেও, উহার গভীরতা অনেকস্থলে নিরূপিত হইয়াছে। সীসক নির্ম্মিত বড় ও ভারি গোলাতে রজ্জু বাঁধিয়া মানরজ্জু প্রস্তুত হয়। ঐ মানরজ্জু সমুদ্রে নিক্ষেপদ্বারা উহার গভীরতা নিরূপিত হইয়া থাকে। সমুদ্রের গভীরতা সচরাচর 'বাম' শব্দদ্বারা ব্যক্ত হয়। এক বাম আমাদিগের ৪ হাত ও ইংরাজী ৬ ফুট।

মানরজ্জুদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সমুদ্রের তলদেশ পৃথিবীর স্থলভাগের ন্যায় কোথাও অনেক উচ্চ এবং কোথাও খুব নিম্ন। কূল হইতে

সমুদ্রের দিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, তাহার গভীরতা ততই বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। আতলান্তিক মহাসমুদ্র ৩—৫ মাইল গভীর। প্রশান্ত মহাসাগরের কোন কোন স্থান ৭।৮ মাইল পর্য্যন্ত গভীর দেখা যায়। ভারত ও দক্ষিণ সমুদ্র ৪—৬ মাইল গভীর। বঙ্গসাগর ১৫০০—২০০০ বাম অর্থাৎ কমবেশী দুই মাইল গভীর দৃষ্ট হয়; অর্থাৎ হিমালয় বঙ্গসাগরে নিমজ্জিত করিলে, উহার অধিকাংশ শৃঙ্গই জলের ভিতর থাকিবে। ভারতের তিনদিকের সাগরের জল ১০০ বাম শুকাইয়া গেলে, কতদূর পর্য্যন্ত তল বাহির হইবে, তাহা ২য় মানচিত্র হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

৭৩। **সংক্ষিপ্তসার।** সমুদ্রের প্রাকৃত অবস্থার বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া প্রথমে সমুদ্রজলের বর্ণ ও লবণত্বের সম্বন্ধে মোটামুটি বলা গিয়াছে। গভীর সমুদ্র স্থান-বিশেষে নীল, লোহিত, পীত, ইত্যাদি বর্ণবিশিষ্ট দেখা যায়। বঙ্গসাগরের জল গাঢ় নীলবর্ণ। অল্প সমুদ্রের জল দেখিতে স্বচ্ছ হইলেও নিতান্ত লবণাক্ত। সমুদ্রের জলে সাধারণতঃ এত লবণাদি কঠিনপদার্থ মিশ্রিত অবস্থায় আছে যে, এক মণ জল শুকাইলে তাহা হইতে প্রায় সাড়ে পাঁচ পোয়া লবণাদি পাওয়া যায়। সমুদ্র-তল নিতান্ত অসম। বঙ্গসাগর প্রায় দুই মাইল গভীর। প্রশান্ত মহাসাগরের স্থানে স্থানে ৭।৮ মাইল গভীরতা দেখা যায়।

২ § ভূ-পৃষ্ঠের উপর সমুদ্রের কার্য্য।

৭৪। **সমুদ্রদ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়।** ইতিপূর্ব্বে স্থলভাগস্থ জলরাশির ভূমিক্ষয়কার্য্য দেখা গিয়াছে। এক্ষণে সমুদ্রজল দ্বারা কিরূপে ভূমি ক্ষয়িত হইতেছে, তাহার বিষয় আলোচনা করা যাইবে।

যিনি বৈশাখজ্যৈষ্ঠ মাসে সমুদ্রতটভাগে কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাঁহারই বিদিত আছে, কেমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউগুলি উঠিয়া উঠিয়া তটাভিমুখে আসিয়া শম্বুক, ঝিনুক, বালুকা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নুড়ী প্রভৃতি লইয়া সজোরে তটের উপর আঘাত করে, এবং কেমন পরক্ষণেই উহাদিগকে টানিয়া লইয়া ঢেউটি সরিয়া যায়। বৈশাখজ্যৈষ্ঠ মাসে বড় বড় নদীতেও এইরূপ দেখা যায়। সমুদ্রের তরঙ্গের বল অনুসারে উহা বালুকা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর হইতে বড় বড় প্রস্তর দ্বারা তাহার তটে আঘাত করিতে থাকে। মনে কর দেখি, তটের মৃত্তিকা, প্রস্তর পুনঃ|পুনঃ জোরে আঘাতপ্রাপ্ত ও সঙ্গে সঙ্গে জলদ্বারা বিধৌত হইলে, তটস্থ প্রস্তরাদি বিচ্ছিন্ন ও চূর্ণীকৃত না হইয়া কতক্ষণ থাকিতে পারে। ঝড়ের সময় ঢেউ কত জোরে তটের উপর আসিয়া পড়ে, ঝড়ের সময় নদীর ঢেউ দেখিলে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। তখন যে ঐরূপে তটদেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে তাহা সহজেই বুঝা যায়। তটদেশ কঠিন শিলাময় হইলে, হয়তঃ বিভগ্ন ও চূর্ণীকৃত হইতে অনেক সময় লাগিবে। কিন্তু নরম প্রস্তর বা মৃত্তিকা থাকিলে, উহা যে অচিরে সমুদ্রগ্রাসে পড়িবে, তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

সমুদ্রতট একবার ভগ্ন করিতে পারিলে, সেই বিচ্ছিন্ন প্রস্তরাদি অপর তট ভাঙ্গিবার সহায় হয়। এরূপ প্রস্তরখণ্ডাদি না পাইলেও, শুদ্ধ ঢেউর জলের বল এবং ভারবশতঃও তটদেশ অল্পাধিক চূর্ণীকৃত হইত সমুদ্রজলে ঢেউ না থাকিলে, তটদেশ বিন্দুমাত্র বিনষ্ট হইত না। কিন্তু কি শীতকাল কি গ্রীষ্মকাল সকল সময়েই সমুদ্রজল আলোড়িত হইতেছে। উহাতে যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড, তালগাছের ন্যায় উচ্চ, তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া লোকের হৃদয় ভয়ে ও গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ করিয়া তুলে, তাহার বর্ণনা হয় না। কিন্তু আবার সময়ে সময়ে উহার যে প্রশান্ত ভাব হয়,

তাহাও না দেখিলে কদাপি বিশ্বাস হয় না। তখন বোধ হয়, যেন একখানি নীলবর্ণ পরকলা বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া আছে।

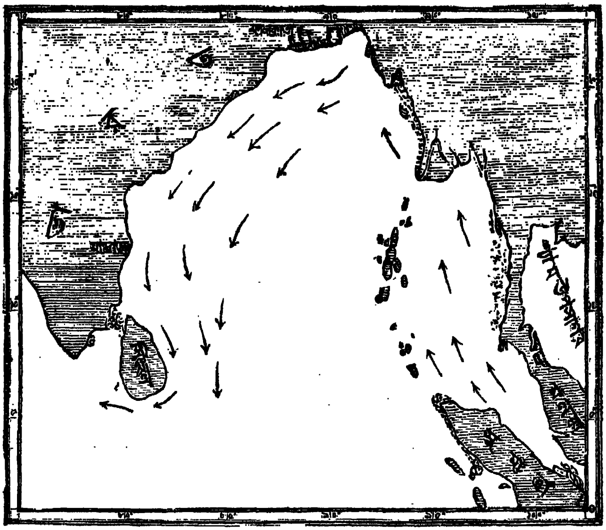

৬ মানচিত্র। ঈশানের মৌসুমী বাতাসের সময়ের অর্থাৎ কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত বঙ্গসাগরের স্রোতের দিক্ শরচিহ্ন দ্বারা দেখান হইয়াছে। বঙ্গসাগরের মধ্যস্থলে পৌষ মাঘ মাসে স্রোত নানাদিকে প্রবাহিত হয়।

কি প্রকারে ঢেউ উৎপন্ন হয়, তাহা বোধ হয়, সকলেই অবগত আছেন। এক বাটী জলে পাখাদ্বারা বাতাস কর, কিম্বা ফুঁ দাও, ঐ জলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ উৎপন্ন হইবে। তদ্রূপ, সমুদ্রের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরঙ্গেরও কারণ বাতাস। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, জলের তরঙ্গ উৎপন্ন হইলেই, উহার অগ্রগতি[১] হয় না। জল কেবল একবার ঊর্দ্ধ ও একবার অধোগত ব্যতীত, অন্যত্র চালিত হয় না। ধান্য-

---

[১] সরল পদার্থ-বিজ্ঞানের তরঙ্গ-প্রকৃতিসম্বন্ধে শব্দ অধ্যায় দেখ।

ক্ষেত্রে বাতাস দিলে ধান্যের গাছের ঢেউ উৎপন্ন হয়। অবশ্য এস্থলে ধান্য গাছগুলি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায় না।

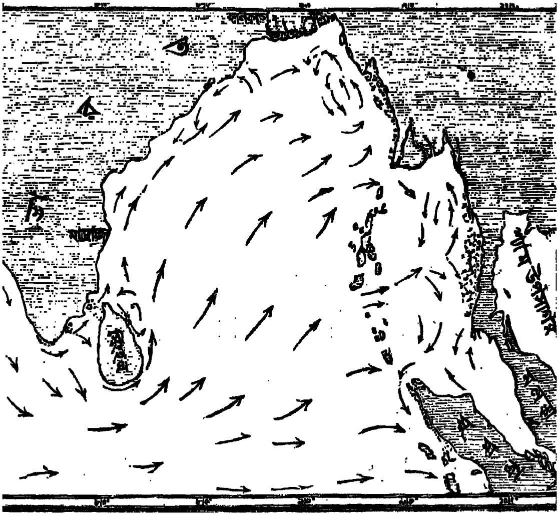

৭ মানচিত্র। নৈঋতের মৌসুমী বাতাসের সময়ের অর্থাৎ বৈশাখ হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত বঙ্গসাগরের স্রোতের দিক্ শর চিহ্নদ্বারা দেখান গেল।

৭৫। সমুদ্র-জলের স্রোত। কিন্তু সমুদ্রে যতই বড় ঢেউ হউক না কেন, উহা অনেক নিম্ন পর্য্যন্ত যায় না। ঐ ঢেউ সচরাচর জলের উপরিদেশেই দেখা যায়। কিন্তু কিয়দ্দিবস ক্রমাগত এক দিক্ হইতে বাতাস বহিলে, সমুদ্রজলের স্রোত উৎপন্ন হয়। বাস্তবিক যে সমুদ্রজলে স্রোত আছে, অর্থাৎ সমুদ্রের এক স্থানের জল অন্য স্থানে যায়, তাহা নানা প্রকার ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয়। আমেরিকাদেশে যে সকল বৃক্ষাদি জন্মে, তাহাদিগের শাখাপল্লব ফল প্রভৃতি অনেক সময় আতলান্তিক সমুদ্র পার হইয়া ইয়ুরোপের

নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে দেখিতে পাওয়া যায়। জাহাজ হইতে ছিপি-আঁটা, শূন্য বোতল নিক্ষিপ্ত হইলে, শত শত মাইল দূরে ভাসিয়া যাইতে দেখা যায়।

সমুদ্রজলের স্রোত নানা স্থানে নানা দিকে প্রবাহিত হয়। বঙ্গসাগরে ঋতুভেদে যে স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহা নিম্নের দুই চিত্র হইতে বুঝা যাইবে। মৌসুমী বাতাসই বঙ্গসাগরের স্রোতের কারণ। শীতকালের ঈশানের মৌসমীর সময় দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিম দিকে[১] এবং গ্রীষ্মকালের নৈঋতের মৌসমীর সময় উত্তর দিকে স্রোত প্রবাহিত হয়। বৈশাখজ্যৈষ্ঠ মাসে স্রোত খুব প্রবল হয়, এবং অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে স্রোত প্রায় আদৌ থাকে না।

সমুদ্রজলের স্রোতদ্বারা ভূমিক্ষয় কার্য্য সম্পাদিত হওয়া সম্ভবপর নহে। তবে তদ্দ্বারা যে এক স্থানের পলি অন্যত্র চালিত হয়, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। নদীর মোহানার নিকট সমুদ্র স্রোত প্রবল হইলে, নদী বাহিত পলি মোহানায় সঞ্চিত হইতে পারে না। এজন্য সমুদ্রস্রোত প্রবল থাকিলে, নদীর মোহানায় ত্রিকোণমণ্ডলভূমি উৎপন্ন হইতে পারে না। উড়িষ্যার উপকূলে যেখানে মহানদী বঙ্গসাগরে মিলিত হইয়াছে, তথায় সমুদ্রস্রোত প্রবল না থাকাতে মহানদীর মোহানার সম্মুখে পলিদ্বারা চর উৎপন্ন হইয়াছে। এজন্য মহানদীতে জাহাজ গমন অসম্ভব হইয়াছে। কিন্তু ভাগিরথীর মোহানায় প্রবল স্রোত প্রতিকূল থাকাতে, তথায় পলি সঞ্চিত হইতে পারে না। এজন্য বহুকালাবধি গঙ্গানদীতে জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে।

---

[১] এস্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যে দিক্ হইতে বাতাস বহে, সেই দিক্ অনুসারে বাতাসের নাম এবং যে দিকে স্রোত প্রবাহিত হয়, সেই দিকের নামে জলের স্রোতের নাম হইয়া থাকে।

৭৬। **সমুদ্রজলের জোয়ার ভাটা।** উপরে সমুদ্রজলের ঢেউ ও স্রোতের বিষয় বর্ণিত হইল। এই দুইটি ব্যতীত, উহার জল জোয়ার ভাটা দ্বারা আলোড়িত হয়। দিবা রাত্রির মধ্যে দুইবার সমুদ্রের জল উচ্চ ও নিম্ন হইতেছে। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে চন্দ্রের ও সূর্য্যের আকর্ষণের পরিমাণ-ভেদে জোয়ার ও ভাটার উৎপত্তি হয়। বিস্তৃত খোলা সমুদ্রে জল স্ফীত হইয়া উঠে। প্রশান্ত মহাসাগরে জোয়ারবশতঃ জল দুই ফুট মাত্র উচ্চ হয়। কিন্তু তটভাগে কিম্বা অল্প গভীর স্থানে জল অনেক উচ্চ হইয়া উঠে। পরে ঐ স্থান হইতে তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবিত হয়। সমুদ্রজলের ঐরূপ স্ফীত হওনের নাম জোয়ার। কোন স্থানে সমুদ্রজল স্ফীত হইলে অপর স্থানের জল নিশ্চয়ই নামিয়া যাইবে। ঐরূপ সমুদ্রজলের উচ্চতার কম হওয়াকে ভাটা বলে।

৭৭। **বান ডাকা।** সমুদ্রের কোন স্থানে জোয়ার উৎপন্ন হইলে, তথা হইতে তরঙ্গ ধাবিত হয়। গভীর জলভাগে ঐ তরঙ্গের অগ্রগতি হয় না। কিন্তু অল্প গভীর জলভাগে ও নদীতে ঐ তরঙ্গায়িত জলের অগ্রগতি হয়। জোয়ারের তরঙ্গ সঙ্কীর্ণ ও স্বল্পগভীর নদীমুখের নিকট উচ্চ হইয়া উঠে এবং নদীর ভিতর নদীজলের স্রোতের বিপরীত দিকে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া থাকে। উহাকে সচরাচর 'বানডাকা' বলে। ভাগীরথী বা হুগলী নদীর বান[১] সামান্য নহে। বানের সময় নৌকাগুলি মধ্যনদীতে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য, কেননা বানের জল তটে গিয়া প্রবলবেগে ভাঙ্গে। কিন্তু মধ্যনদীতে জল কেবলমাত্র স্ফীত হইয়া আইসে। বানের মুখে নৌকার পার্শ্বে পড়িলে, উহার বাঁচিবার সম্ভা-

---

[১] বান ও বন্যা শব্দে প্রভেদ বুঝিতে হইবে। বর্ষাকালে নদীজল বর্দ্ধিত হইয়া নদীর উভয়পার্শ্ব প্লাবনকে বন্যা, এবং সমুদ্রের জোয়ারের জল নদীতে উচ্চ হইয়া প্রবেশ করাকে বান বলা গেল।

বনা থাকে না। ঈশানকোণের মৌসুমের সময় অপেক্ষা দক্ষিণপশ্চিমের মৌসুমের সময় বানের জোর বেশী হয়। চৈত্র মাসের বান সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক। পূর্ণিমার আগের দুই দিবস ও পরের দুই দিবস আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র এই তিন মাসে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও বেশী জোরে বান ডাকে। ইহার কারণ এই যে, তখন নদী প্রায় পূর্ণ থাকে এবং তখন দক্ষিণে বাতাস জোয়ারের জল নদীমধ্যে ঠেলিয়া দিতে চেষ্টা করে। গঙ্গাসাগর হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত বানের বেগ প্রতিঘণ্টায় প্রায় ৭ মাইল। কিন্তু কলিকাতার নিকট ও উপরে প্রতিঘণ্টায় প্রায় ২০ মাইল বেগে চলে। স্থানে স্থানে বানের ঢেউ ৮।১০ হাত উচ্চ হইয়া আইসে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, নদীর মোহানার নিকট সমুদ্রস্রোত প্রবল ও প্রতিকূল থাকিলে, নদীবাহিত পলিদ্বারা তথায় চর ও ত্রিকোণমণ্ডল ভূমি উৎপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু নদীর মুখ খোলা রাখিবার পক্ষে নদীর বানই অধিকতর কার্য্যকারক। হুগলী, মাতলা, হরিণঘাটা প্রভৃতি নদীতে এবং উহাদিগের মোহানায় জোয়ার ভাটা প্রবলবেগে হওয়াতে, তথায় নদীবাহিত পলি সঞ্চিত হইতে পায় না। এজন্য নদীর মোহানা পূর্ণগভীর থাকিয়া জাহাজ নৌকা প্রভৃতির যাতায়াতের ব্যাঘাত জন্মায় না। তবেই দেখ, জোয়ারভাটাদ্বারা বাণিজ্যের একটি মহোপকার সাধিত হয়।

সকলের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, নদীতে সমুদ্রের জোয়ারের জল প্রবেশ করিয়া 'বান' আসিলে, উহাকে নদীর জোয়ার বলে এবং ঐ বানজল ক্রমে সমুদ্রে পুনর্ব্বার চলিয়া গেলে, নদীর ভাটা হয়। সমুদ্রের এবং নদীর জোয়ার ভাটার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে। সমুদ্রের জোয়ার ভাটায় তরঙ্গমাত্র উৎপন্ন হয়, কিন্তু নদীর জোয়ার ভাটায় জলের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গতি হয়।

৭৮। সংক্ষিপ্তসার। এই অনুচ্ছেদে সমুদ্রের দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষতি বৃদ্ধি বিচার করা গিয়াছে। সমুদ্র নিশ্চল অবস্থায় থাকে না; মৃদু মন্দ হিল্লোল হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরঙ্গমালা দ্বারা সমুদ্রপৃষ্ঠ সর্ব্বদাই আলোড়িত হইতেছে। এই তরঙ্গের কারণ বাতাস। তরঙ্গদ্বারা সমুদ্র-তটদেশমাত্র ক্ষয়িত হইতেছে। প্রস্তর, নুড়ী, কাঁকর, বালুকা প্রভৃতি লইয়া জোরে তটে আঘাত করিবার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রজল তাহা ধুইয়া লইয়া যাইতেছে। উহার স্রোত ঐ সমস্ত ক্ষয়িত প্রস্তর এবং নদীবাহিত পলি (পল্বল্) দূরদেশে লইয়া গিয়া সমুদ্রতলে স্তর উৎপাদন করিতেছে। বঙ্গসাগরে মৌসুমী বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে স্রোত পরিবর্ত্তন হয়। কোন কোন সমুদ্রের স্রোত বারমাস একই দিকে প্রবাহিত হইতেছে। স্রোতদ্বারা নদীর মোহানায় পলি সঞ্চয় নিবারিত হইয়া থাকে। কিন্তু সমুদ্রের জোয়ারের জল নদীতে প্রবেশ এবং ভাটার সময় নদীর বেগ বৃদ্ধি করিয়া, পলি প্রভৃতি নদীগর্ভ হইতে টানিয়া দূরসমুদ্রে নিক্ষেপ করে। এই জন্য ভাগীরথী, মাতলা প্রভৃতি নদীতে আজও পর্য্যন্ত জাহাজ গমনাগমন করিতেছে। সমুদ্রের জোয়ার ভাটায় জলের তরঙ্গমাত্র উৎপন্ন হয়। কিন্তু নদীর জোয়ার ভাটায় একস্থানের জল অন্য স্থানে নীত হয়। সমুদ্রের জোয়ারের জল নদীতে উচ্চ হইয়া প্রবেশ করাকে "বান ডাকা" বলে।

চতুর্থ অধ্যায়।

পৃথিবীর আভ্যন্তরিক ব্যাপার।

১ § ভূ-গর্ভের উষ্ণতা।

৭৯। প্রথম অধ্যায়ে বায়ুর উষ্ণতার বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখিয়াছি যে, সূর্য্যই আমাদিগকে আলোক ও তাপ দিয়া জীবিত রাখিয়াছে এবং বায়ুর উষ্ণতার কারণ সূর্য্য। সূর্য্যের কিরণদ্বারা ব্যতীত পৃথিবী স্বীয় তাপে উষ্ণ হইয়া রহিয়াছে। এতদ্বিষয় এখানে বর্ণিত হইতেছে।

৮০। **পৃথিবীর আদিম অবস্থা।** ভূ-তত্ত্ব ও জ্যোতিষ-শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরা নানা কারণবশতঃ অনুমান করেন যে, আমাদিগের পৃথিবী অতীব আদিম অবস্থায় একটি জ্বলন্ত পিণ্ডাকারে ছিল। এমন কি, আরও পূর্ব্বে উহা ও অন্যান্য গ্রহগণ, যাহারা অদ্যাপি নিরন্তর সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে তাহারা, ও সূর্য্য একই বস্তু ছিল। কাল-ক্রমে কোন অজ্ঞাত কারণবশতঃ গ্রহগণ ও পৃথিবী সূর্য্য হইতে বিচ্যুত হইয়া, সূর্য্যের চারিদিকে প্রবল বেগে পরিভ্রমণ করিতেছে। এক্ষণে সূর্য্য যেরূপ অবস্থায় আছে, পৃথিবী ও গ্রহগণ পূর্ব্বে ঐ সূর্য্যের অংশ-মাত্র থাকাতে, উহারাও সূর্য্যের ন্যায় জ্বলন্ত ও অতীব উষ্ণ ছিল। পৃথিব্যাদি হইতে ক্রমাগত চতুর্দ্দিকে আকাশে তাপ বিকীর্ণ হওয়াতে, উহারা শীতল হইয়াছে।

কিন্তু সহজেই বোধগম্য হইবে যে, পৃষ্ঠ-দেশের ন্যায়, পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ কখন শীঘ্র শীতল হইতে পারে না। এজন্য অনুমান করা

যায় যে, উহার পৃষ্ঠ-দেশ হইতে কেন্দ্রের দিকে কিয়দংশ মাত্র জমিয়া কঠিন ভাবাপন্ন হইয়াছে। বোধ হয়, এই কঠিনাংশ ৫০ হইতে ১০০ মাইল পুরু হইবে। কিন্তু পাঠকগণের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, পৃথিবীর আভ্যন্তরিক ও আদিম অবস্থার বিষয় যাহা উপরে লিখিত হইল, তৎসমুদায় অনুমানমাত্র। বৈজ্ঞানিক ঘটনার আলোচনা করিবার সময়, অধিকাংশ স্থলে এইরূপ অনুমান ও কল্পনা করিতে হয়। এমন কি, অনেক স্থলে প্রথমে কল্পনা করিয়া বিবেচ্য বিষয়ের কথঞ্চিৎ আকার দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হয়, এবং পরে ঐ কল্পনার সত্যাসত্যের বিচার করিয়া সত্যে উপনীত হওয়া যায়। ফলতঃ কল্পনা নিতান্ত আবশ্যক। যখন ঐ কল্পনা জ্ঞানদ্বারা সীমাবদ্ধ না হয়, তখনই অসার ও কুফলপ্রদ হইয়া উঠে।

৮১। খনি ও কূপ হইতে ভূগর্ভের উষ্ণতার প্রমাণ।

পৃথিবীর আভ্যন্তরিক তাপের সম্বন্ধে যে অনুমান করা গেল, উহা কতদূর সত্য, এক্ষণে তাহা দেখা যাউক। পৃথিবীর পৃষ্ঠ-দেশ হইতে কত মাইল নিম্নপর্য্যন্ত জমিয়া কঠিন হইয়াছে এবং উহার অন্তর্ভাগ এখন কিরূপ অবস্থায় আছে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কখন পাইতে পারি না। পৃথিবীর নানা স্থানে পাথুরিয়া কয়লা, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যের জন্য অসংখ্য অসংখ্য খনি এবং জল পাইবার জন্য গভীর কূপসকল খনন করা হইয়াছে। কিন্তু তৎসমুদয়ের নিমিত্ত পৃথিবীর অতি অল্প নিম্নপর্য্যন্ত জানা গিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত যত গভীর কূপ খনন করা হইয়াছে, তন্মধ্যে বার্লিণ নগরের নিকট যে কূপ কাটা হইয়াছে, তাহাই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা গভীর[১]। কিন্তু উহাও কেবল

---

[১] অতি অল্প দিন হইল আর একটি গভীর কূপ খননের বিষয় শুনা গিয়াছে। তাহা নাকি আট হাজার ফুটের বেশী গভীর। কিন্তু ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

৪,১৭২ ফুটমাত্র অর্থাৎ এক মাইলেরও কম। বোধ হয়, ৬,৬০০ ফুটের বেশী গভীর খনি কাটা হয় নাই। যাহা হউক, ভূ-পৃষ্ঠ হইতে প্রায় এক মাইলের বেশী নিম্ন পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ প্রায় ৪,০০০ মাইল। ঐ চারিহাজার মাইলের সহিত তুলনায় এক মাইল কিছুই নহে। কিন্তু ঐ এক মাইল পর্য্যন্ত যাহা জানা গিয়াছে, তাহা এবং আগ্নেয়গিরি হইতে আমরা ভূ-গর্ভের নিরতিশয় উষ্ণতা সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হই।

ভূ-পৃষ্ঠে দিবসে সূর্য্যকিরণ পতিত হওয়াতে, উহার উষ্ণতার বৃদ্ধি এবং রাত্রিতে তাপের বিকিরণ হওয়াতে ঐ উষ্ণতার হ্রাস হয়। এজন্য ভূ-পৃষ্ঠের উষ্ণতা কখন সমান থাকে না। কিন্তু সূর্য্যতাপ মৃত্তিকাদির ভিতর দিয়া অধিক নিম্নে যাইতে পারে না। কারণ মৃত্তিকাদি নানাবিধ প্রস্তর তাপ-সুপরিচালক নহে। বায়ুর এবং ভূ-পৃষ্ঠের মৃত্তিকার উষ্ণতার পরিবর্ত্তন প্রতিদিন ও প্রতিঘণ্টায় ঘটিতেছে। কিন্তু কয়েক হস্ত নিম্নে এরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। আরও কিঞ্চিৎ নিম্নে উষ্ণতার বাৎসরিক হ্রাসবৃদ্ধি দেখা যায় না। অর্থাৎ তথায় কি গ্রীষ্ম কি শীতকাল, সকল সময়ই উষ্ণতা একই ভাবে থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু পৃথিবীর সকল স্থানে একই গভীরতায় এরূপ দেখা যায় না। পারী নগরীতে ৭৫ বৎসর কাল ৯১ ফুট বা ৬০ হাত নিম্নে এক তাপমান-যন্ত্র রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে, অত বৎসরের মধ্যে তথায় উষ্ণতার মোটে অর্দ্ধ তাপাংশের বেশী পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

ভারতের কত হাত নিম্নে এরূপ স্থান পাওয়া যায়, তাহা ঠিক নিরূপিত হয় নাই। তবে এসম্বন্ধে যে পর্য্যবেক্ষণ করা হইয়াছিল, তাহাতে জানা যায় যে, পৃষ্ঠদেশ হইতে ৬০ ফুট বা ৪০ হাত নিম্নে ৮১°ফা অপরিবর্ত্তনশীল উষ্ণতা পাওয়া যায়। মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে,

ভারতে ৪০ হাত নিম্নে সূর্য্যকিরণবশতঃ মৃত্তিকার উষ্ণতার হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। এই ৪০ হাতের মধ্যে দিবারাত্রি ও শীত গ্রীষ্ম ঋতুভেদে মৃত্তিকার উষ্ণতার অল্পাধিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে।

কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠ হইতে যতই নিম্নে যাওয়া যায়, উষ্ণতার ততই বৃদ্ধি দেখা যায়। এদেশে ৬০ ফুট নিম্নে ৮১°ফা উষ্ণতা হইতে প্রতি ৬৬ ফুট গভীরতার বৃদ্ধিতে ১°ফা উষ্ণতার বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। অর্থাৎ ১২৬ ফুট নিম্নে ৮২°ফা, ১৯২ ফুট নিম্নে ৮৩°ফা, ২৫৮ ফুট নিম্নে ৮৪°ফা। বরাবর এই হারে উষ্ণতা বৃদ্ধি হইলে প্রায় দুই মাইল নিম্নে মৃত্তিকার উষ্ণতা ফুটন্ত জলের উষ্ণতার বেশী হইবে এবং ত্রিশ মাইলের এদিকেই এত উষ্ণতা দেখা যাইবে যে, লৌহ, মৃত্তিকা প্রভৃতি যাবতীয় পার্থিব সামগ্রী তাহাতে দ্রবীভূত হইয়া যাইবে। এজন্য অনুমান করা যায় যে, সমস্ত ভূ-গর্ভ উত্তাপে দ্রবীভূত অবস্থায় আছে। কিন্তু অন্যান্য নানা কারণবশতঃ মনে হয় যে, ভূ-মধ্যভাগটি কঠিন অবস্থায় থাকিয়া, তাহার চতুর্দ্দিকে উত্তাপে তরলীকৃত একটি অংশ রহিয়াছে এবং ঐ তরলীকৃত অংশের উপর কঠিন ভূ-পঞ্জর অবস্থিত।

৮২। সংক্ষিপ্তসার। এই অনুচ্ছেদে ভূ-গর্ভের উষ্ণতার বিষয় বিচার করা গিয়াছে। পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ কিরূপ, তাহা আমরা কোন উপায়েই জানিতে পারি না। কিন্তু অদ্যাবধি ভূ-পৃষ্ঠ হইতে যতদূর নিম্ন পর্য্যন্ত খনন করা গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, গভীরতার আধিক্যে উষ্ণতার বৃদ্ধি হয়। ভূ-গর্ভের নিরতিশয় উষ্ণতায় বোধ হয় তথাকার যাবতীয় সামগ্রী গলিত অবস্থায় আছে। নিম্নে এই অনুমানের সত্যতা সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে।

২ § উষ্ণপ্রস্রবণ।

৮৩। পূর্ব্বে প্রস্রবণ সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা গিয়াছে। প্রস্রবণ হইতে ভূ-গর্ভের উষ্ণতার আধিক্যের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

উষ্ণ ও শীতল, এই দুই শ্রেণীতে যাবতীয় প্রস্রবণ ভাগ করা যাইতে পারে। এস্থলে উষ্ণ-প্রস্রবণের বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। বিভিন্ন প্রস্রবণ হইতে বিভিন্ন প্রকারের জল নিসৃত হইয়া থাকে। জল স্বচ্ছ হইলেই বিশুদ্ধ হয় না। চূণের জল দেখিতে স্বচ্ছ, অথচ তাহাতে চূণ মিশ্রিত থাকে। ভূ-গর্ভ হইতে জল উত্থিত হওয়াতে, ঐ জলে নানাপ্রকার খনিজ পদার্থ দ্রবীভূত থাকে। ভারতে বহুসংখ্যক প্রস্রবণ আছে। অনেকগুলিতে খনিজ পদার্থ দ্রবীভূত থাকাতে, উহাদিগের জল ঔষধস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। তেনাসিরম প্রদেশ, হাজারিবাগ জেলার অধিকাংশ স্থান, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, সিন্ধুদেশ, কঙ্কণ—এই সমস্ত প্রদেশে অনেক প্রস্রবণ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের অধিকাংশই উষ্ণ। হাজারিবাগের কতকগুলি, নর্ম্মদানদীর ও কঙ্কণের কয়েকটি প্রস্রবণের জলে গন্ধক পাওয়া যায়। সিন্ধুদেশে ও পঞ্জাবের উত্তরাংশে লবণ-প্রস্রবণ দেখা যায়। নীলগিরি ও হিমালয়ের কয়েকটি প্রস্রবণের জলে লৌহ মিশ্রিত আছে। লৌহ ও গন্ধকমিশ্রিত প্রস্রবণের জল স্বাস্থ্যসম্বন্ধে বিশেষ উপকারী।

আমাদের দেশে উষ্ণপ্রস্রবণ হইলেই লোকে তাহাকে কোন না কোন ঠাকুরের স্থান বলিয়া পবিত্র মনে করেন। কাল্লু প্রদেশে মণিকর্ণ নামক উষ্ণপ্রস্রবণে স্নানকারীগণের সুবিধার্থঘাট ইত্যাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। মণিকর্ণের জলের উষ্ণতা প্রায় ২০৮° ফা অর্থাৎ ফুটন্তজলের উষ্ণতার প্রায় সমান। গড়বাল প্রদেশে যমুনোত্রি, গঙ্গোত্রি, কেদারনাথ, বদ্রিনাথ নামক উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। কথিত আছে, যমুনোত্রি

প্রভৃতির জল এত উষ্ণ যে, তথাকার লোকেরা তাহাতে অনায়াসে অন্ন পাক করিয়া থাকে।

সিমলা-শৈলে নাগকুণ্ড, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড, রাজমহল ও সূরীর মধ্যস্থিত কালিঝরণা প্রভৃতি, সূরীর পশ্চিমস্থিত লকরকুণ্ড, মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ড ও পূর্ব্বোক্ত মণিকর্ণ প্রভৃতি বিশেষ বিখ্যাত। ভারতের মধ্যে ন্যূনাধিক ৬০। ৭০টি প্রসিদ্ধ উষ্ণপ্রস্রবণ আছে।

সর্ব্বদেশ মধ্যে ইয়ুরোপেই উষ্ণপ্রস্রবণ বেশী। এক ফ্রান্স দেশেই আট শতের, স্পেন দেশে চারি শতের অধিক বর্ণিত হইয়াছে। জর্ম্মনি, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে আরও কত আছে। আইসলাণ্ড দ্বীপে গাইসার নামক অসংখ্য উষ্ণপ্রস্রবণ হইতে অত্যুষ্ণ জল মধ্যে মধ্যে প্রবলবেগে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

৮৪। সংক্ষিপ্তসার। এই অনুচ্ছেদে ভূ-গর্ভের উষ্ণতার আধিক্যের একটি প্রমাণ দেওয়া গিয়াছে। পৃথিবীর নানাস্থানে অসংখ্য অসংখ্য উষ্ণপ্রস্রবণ দেখিতে পাওয়া যায়। শুদ্ধ ভারতের মধ্যেই ন্যূনাধিক ৬০। ৭০ উষ্ণপ্রস্রবণের বিবরণ পাঠ করা যায়। এতদ্ভিন্ন আরও কত আছে, তাহাদিগের বর্ণনা পাওয়া যায়না। ভূ-গর্ভের উষ্ণতাবশতঃ ঐ সমস্ত প্রস্রবণের জল উষ্ণ দেখা যায়। পৃথিবীর নানা-স্থানেই এরূপ দেখা যায়। এতদ্দ্বারা অনায়াসে প্রতীতি হইবে যে,সমগ্র ভূ-গর্ভের না হইলেও উহার অধিকাংশ স্থলেরই উষ্ণতা অধিক।

৩ § আগ্নেয়-পর্ব্বত।

৮৫। আগ্নেয়গিরি। আগ্নেয়-পর্ব্বত ভূ-গর্ভের নিরতিশয় উষ্ণতার বিশেষ প্রমাণ। পৃথিবীর নানাস্থানে বড় বড় ফাট আছে। ঐ সকল ফাট ভূ-গর্ভ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া ভূ-পৃষ্ঠের নিকট ছোট বড়

গহ্বরাকার ধারণ করিয়াছে। ঐ সকল ফাট হইতে মধ্যে মধ্যে বা ক্রমাগত অত্যুষ্ণ অর্দ্ধগলিত প্রস্তর, জলীয় বাষ্প নানাবিধ গ্যাস প্রভৃতি পদার্থ প্রবলবেগে উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে। ঐ সমস্ত উৎক্ষিপ্ত পদার্থ গহ্বরের চারিদিকে পতিত হওয়ায় গিরি উৎপন্ন হয়। এবম্বিধ গিরিকে আগ্নেয়গিরি বলে। কিন্তু পাঠকের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, সাধারণতঃ যাহাকে গিরি বা পর্ব্বত বলা যায়, তাহা হইতে আগ্নেয়গিরির বিস্তর প্রভেদ। প্রস্তর, পাংশু ও গলিত দ্রব্যাদি ফাটের উপর স্তূপাকার হইয়া গিরি নাম প্রাপ্ত হয়। নিম্নে একটি আগ্নেয়গিরির ছেদ দেখান গেল। ইহা দ্বারা উহার ফাট ও ফাটের চারিদিকের উৎক্ষিপ্ত পদার্থের স্তূপদ্বারা গঠিত গিরিরূপ ধারণ বুঝা যাইবে।

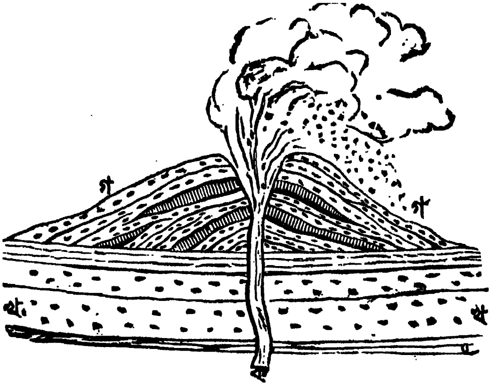

১৭ চিত্র। আগ্নেয়গিরির ছেদ। ক ফাট, খ খ ভূপৃষ্ঠের স্তর গ গ উৎক্ষিপ্ত পদার্থের স্তর।

৮৬। আগ্নেয়গিরির উৎক্ষেপ। অগ্নেয়গিরি হইতে যে সমস্ত দ্রবীভূত ধাতু প্রস্তরাদি উত্থিত হয়, তৎসমুদয়কে নিঃস্রব বলে। উৎক্ষেপের প্রাক্কালে কখন কখন গভীর গর্জ্জন শুনা যায়। প্রায়ই জলীয়

বাষ্প থাকিয়া থাকিয়া প্রভূত পরিমাণে উৎক্ষিপ্ত হইয়া মেঘরূপ ধারণ করে। জলীয় বাষ্পের সঙ্গে নানাবিধ গ্যাস ও অন্যান্য বাষ্পও উত্থিত হয়। প্রকৃত উৎক্ষেপের অগ্রে বড় বড় প্রস্তর সকল সময়ে সময়ে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। আমেরিকার কোটাপাক্সী নামক আগ্নেয়গিরি হইতে একবার ৯ ফুট ব্যাসের একটা প্রকাণ্ড প্রস্তর গিরি হইতে ১৫ মাইল দূরে প্রক্ষিপ্ত হয়। খৃঃ ১৭৪৯ অব্দে বঙ্গসাগরের ব্যারেণ নামক আগ্নেয়-গিরি হইতে প্রায় শত মণ ভারি ভারি প্রস্তরসমূহ বৃষ্টি হইয়াছিল। উৎক্ষেপকালে নিঃস্রব পদার্থ কথন কথন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ধূলিকণিকা ও পাংশুতে পরিণত হয়। তথন তাহাকে আগ্নেয় ধূলি বা পাংশু বলে। ইষ্টক পোড়াইবার সময় যেমন ছিদ্রবহুল, লঘু ঝামার উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ নিঃস্রব পদার্থ কঠিন হইলে তাহা বহুছিদ্রপূর্ণ লঘু প্রস্তরে পরিণত হয়। বস্তুতঃ অধিকাংশ আগ্নেয় প্রস্তর বহুছিদ্রবিশিষ্ট।

আগ্নেয়গিরির পাংশু, ধূলি সময়ে সময়ে কয়েক দিবস ব্যাপিয়া বায়ুতে ভাসমান থাকিয়া আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করিয়া রাখে। সুমাত্রাদ্বীপে আগ্নেয়-পর্ব্বতের উৎক্ষেপে একবার এক হাজার মাইল দূরবর্ত্তী সমুদ্রের উপর দুই ফুট পুরু পাংশুস্তর ভাসিয়াছিল। খৃঃ ১৮১৫ অব্দে সম্বয়া-দ্বীপের তোম্বোরো নামক আগ্নেয়গিরির উৎক্ষেপের সময় ৩০০ মাইল দূরবর্ত্তী জাবা দ্বীপের গৃহাদি ও পথ ঘাট পাংশুতে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। এইরূপে খৃঃ ৭৯ অব্দে বিসুবিয়স্ আগ্নেয়গিরি হইতে এত পাংশু উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল যে, তাহাতে পম্পী ও হারকিউলিনিয়ম্ নামক দুইটি নগর ৭৯—১১২ ফুট পর্য্যন্ত গভীর পাংশুস্তরে নিমগ্ন হইয়া ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল।

কোন কোন আগ্নেয়গিরি হইতে ক্রমাগত নিঃস্রবাদি উৎক্ষিপ্ত হইতেছে। ভূমধ্য-সাগরে লিপারি-দ্বীপপুঞ্জে স্ত্রম্বোলি নামক এক

আগ্নেয়গিরি আছে। উহার উৎক্ষেপের বিরাম নাই। অধিকাংশগুলি মধ্যে মধ্যে কিছুকাল নির্ব্বাণ বা সুপ্ত অবস্থায় থাকিয়া পরে হঠাৎ নিঃস্রবাদি উৎক্ষেপ করে। ইহাদিগকে আহিতাগ্নি আগ্নেয়গিরি বলে। এট্না, বিসুবিয়স্, হেক্‌লা প্রভৃতি আগ্নেয়গিরিসকল এই শ্রেণীর উদাহরণ। আবার কতকগুলির এক্ষণে কেবলমাত্র গহ্বর দৃষ্ট হয়, কিন্তু উহাদিগের উৎক্ষেপ দেখা যায় না। এই সকল আগ্নেয়গিরিকে বীতাগ্নি আগ্নেয়গিরি বলে। আমাদের দেশে দাক্ষিণাত্যে এরূপ কতকগুলি আগ্নেয়গিরি দেখা যায়। ইরাবতী নদীর ৩০ মাইল পূর্ব্বে পুপ্পাতুঙ্গ ও হগুত্রংশান নামক এরূপ দুইটি আগ্নেয়গিরি আছে।

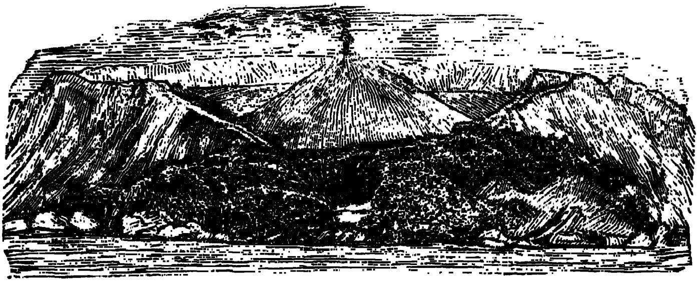

১৮ চিত্র। বঙ্গসাগরের ব্যারেণ নামক আগ্নেয়গিরির দৃশ্য।

ভারতে আহিতাগ্নি আগ্নেয়গিরি সম্প্রতি নাই। তবে বঙ্গসাগরে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের নিকট ব্যারেণ নামক দ্বীপে একটি আগ্নেয়গিরি আছে। উহা হইতে প্রস্তরাদি ও নিঃস্রব উৎক্ষিপ্ত হইয়া উহা এক্ষণে নৈবদ্যাকৃতি ধারণ করিয়াছে। বিগত ৮৪ বৎসর হইল উহার উৎক্ষেপ হয় নাই। সমস্ত দ্বীপটি নিঃস্রব-পদার্থে গঠিত হইয়াছে। উহার ব্যাস প্রায় ১½ মাইল এবং উচ্চতা প্রায় ১,০০০ ফুট। খৃঃ ১৭৮৯ অব্দের উৎক্ষেপে উহা প্রায় ৪০ ফুট উচ্চ হইয়া পড়িয়াছে। এই দ্বীপটিকে

ব্যারেণ বা অনুর্ব্বর বলিবার কারণ এই যে, উহার এক পার্শ্ব ব্যতীত অন্য কুত্রাপি বৃক্ষাদি দৃষ্টিগোচর হয় না। এই দ্বীপের উত্তরে নরকোন্দম নামক একটি বীতাগ্নি আগ্নেয়গিরি আছে। উহা প্রায় ১,৩০০ ফুট উচ্চ ও বড় বড় বন্য বৃক্ষে ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

সমুদ্রগর্ভেও আগ্নেয়গিরি বিরল নহে। আইসলাণ্ড, সিসিলি প্রভৃতি অনেকগুলি দ্বীপ ভূগর্ভোৎক্ষিপ্ত দ্রব্যাদিতে অনেকাংশে বর্দ্ধিতকলেবর হইয়াছে। খৃঃ ১৮৩১ অব্দে জুলাই মাসে সিসিলির উত্তরপশ্চিমে ফার্ডিনাণ্ড নামক এক নূতন দ্বীপ হঠাৎ ভূমধ্য-সাগর হইতে উত্থিত হইয়াছিল। বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, উহা দুই মাস পরে একদা ঐরূপ হঠাৎ সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে।

যাবাদ্বীপে আগ্নেয় পর্ব্বতের উৎক্ষেপ যেরূপ ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করে, এরূপ পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে অল্পই দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ যাবাদ্বীপ অগ্নিময় দ্বীপ। উহা চতুর্দ্দিকে উত্তপ্ত সমুদ্রে পরিবেষ্টিত, উপরে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রখর কিরণে উত্তপ্ত এবং নিম্নে আগ্নেয় পর্ব্বতের অগ্নিময় দ্রবপদার্থে পরিপ্লাবিত। উহার আয়তন যৎসামান্য হইলেও আমেরিকাতে যতগুলি আগ্নেয়গিরি আছে, প্রায় ততগুলি উহাতে আছে এবং প্রত্যেকটি এট্না গিরির অপেক্ষাও ভয়ানক।

প্রশান্তসাগরের দক্ষিণ ভাগে সাণ্ডউইচ নামক দ্বীপপুঞ্জে যে প্রকার ভয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরি আছে, তত্তুল্য অন্য কুত্রাপি নাই। ঐ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে হাওয়াই নামক দ্বীপে লোয়া গিরির ন্যায় প্রকাণ্ড ও ভীষণ আগ্নেয়গিরি অতি বিরল। উহার উচ্চতা ১৮,০০০ ফুট অর্থাৎ প্রায় ৩½ মাইল। উহার গহ্বরের তুল্য প্রকাণ্ড গহ্বর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। উহা প্রায় ২ মাইল দীর্ঘ, প্রায় ১ মাইল প্রশস্ত এবং ৮০০ ফুট গভীর। খৃঃ ১৮৬৫ অব্দে উহার যে উৎক্ষেপ হয়, ২০ দিবারাত্রির মধ্যে তাহার

বিশ্রাম ছিল না এবং তাহার ভীষণ গর্জ্জন ৪০ মাইল দূর হইতে শ্রবণগোচর হইয়াছিল।

৮৭। **কর্দ্দমগিরি।** ইতিপূর্ব্বে উষ্ণ প্রস্রবণের বিষয় লিখিত হইয়াছে। কোথাও কোথাও প্রস্রবণের জল মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া তরল কর্দ্দমরূপে বহির্গত হয় এবং ফাটের চারিদিকে জমাট বাঁধিয়া গিরির আকার ধারণ করে। এই প্রকার গিরি কর্দ্দমগিরি নামে অভিহিত হয়।

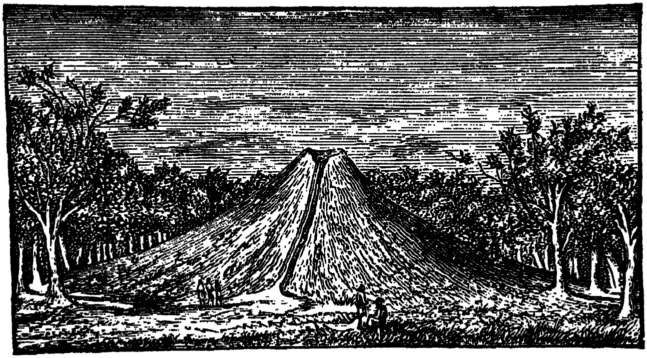

১৯ চিত্র। রামড়িদ্বীপের একটি কর্দ্দম-গিরির দৃশ্য।

আমাদিগের দেশে এরূপ কয়েকটি কর্দ্দমগিরি আছে। আরাকাণ পর্ব্বতমালার নিকট ও আকয়ব নগরের দক্ষিণে অনেকগুলি ছোট বড় দ্বীপ আছে। তন্মধ্যে রামড়ি ও চেদুব নামক দ্বীপের অনেকগুলি কর্দ্দমগিরি বিখ্যাত। চেদুব দ্বীপে দুইটি বড় গিরি রহিয়াছে। উহারা প্রত্যেকে ৪০০।৫০০ হাত প্রশস্ত এবং সমুদ্রজলসীমা হইতে ২০০।৩০০ হাত উচ্চ। ঐ সকল হইতে সচরাচর অল্পপরিমাণে কর্দ্দম বহির্গত হয়। কিন্তু সময়ে সময়ে ভয়ানক গর্জ্জনসহ প্রস্তর ও কর্দ্দম মিশ্রিত হইয়া প্রবলবেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। তৎসঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ দাহ্যমান গ্যাস

প্রভূত পরিমাণে বহির্গত হইবার সময় কখন কখন জ্বলিয়া উঠিয়া চারিদিকে দুই তিন মাইল পর্য্যন্ত স্থান আলোকময় করিয়া ফেলে।

আরাকাণ পর্ব্বতমালা ব্যতীত উত্তর আসামে, ভারতের পশ্চিম পার্শ্বে এবং বেলুচিস্থানে কয়েকটি কর্দ্দমগিরি আছে। এই সমুদায় কর্দ্দমগিরি প্রকৃত আগ্নেয়গিরি কি না, তাহা সবিশেষ নিরূপিত হয় নাই। তবে তাহারা আগ্নেয়গিরি প্রদেশে বিদ্যমান থাকাতে, অনেকে উহাদিগকে প্রকৃত আগ্নেয়গিরি ভাবিয়া থাকেন। যাহা হউক এই সকলের সহিত ভূমিকম্পের বিশেষ সম্বন্ধ দেখা যায়। এতদ্বিষয় পরে বর্ণিত হইবে।

৮৮। আগ্নেয়গিরির সংস্থান ও উৎক্ষেপের কারণ।

পৃথিবীর মধ্যে আগ্নেয়গিরির সংস্থান বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর অধিকাংশ আগ্নেয়গিরি পরস্পর শ্রেণীবদ্ধরূপে অবস্থিত। অত্যল্পভাগ বিশ্লিষ্টভাবে রহিয়াছে। টেরাডেলফ্যুগো হইতে উত্তরাভিমুখে দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার পশ্চিম প্রান্ত দিয়া আলুসিয়ান, কামস্কাট্‌কা এবং যাপান দ্বীপ হইতে ফিলিপাইন ও মলক্কা দ্বীপ পর্য্যন্ত আগ্নেয়গিরির এক শ্রেণী দেখা যায়। মলক্কাদ্বীপে ঐ শ্রেণী দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এক শ্রেণী দক্ষিণপূর্ব্বদিকে পাপুয়া, নব হিব্রিডিজ এবং নব জীলণ্ডে গিয়াছে, অপরটি জাবা, সুমাত্রা, ব্যারেণ ও নরকোন্দম দ্বীপ, পরে রামড়ি ও চেডুব দ্বীপ দিয়া আরাকাণ ও চট্টগ্রামের পাহাড়ে মিশিয়াছে।

আর একটি আশ্চর্য্য বিষয় দেখা যায় যে, প্রায় যাবতীয় আগ্নেয়গিরি সমুদ্রমধ্যে কিম্বা সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত। এজন্য অনেকে অনুমান করেন যে, ভূ-পৃষ্ঠে যে অসংখ্য অসংখ্য ফাট রহিয়াছে, তন্মধ্য দিয়া জল ভূ-গর্ভে উপস্থিত হয়। তথাকার অতীব ভয়ানক উত্তাপে

উহা বাষ্পীভূত হইয়া আগ্নেয়গিরির উৎপত্তি করে। আগ্নেয়গিরির উৎক্ষেপের কারণ সম্যক্ অবগত হওয়া যায় নাই। যাহা হউক পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, পৃথিবীর নানাস্থানে ন্যূনাধিক ৪০০ শত আগ্নেয়গিরি বর্ত্তমান আছে। এতদ্দ্বারা অনায়াসে উপলব্ধ হইবে যে, ভূগর্ভের অনেকখানি অংশ কেবলমাত্র গলিত দ্রব্যাদিতে পরিপূর্ণ।

৮৯। **সংক্ষিপ্তসার।** এই অনুচ্ছেদে আগ্নেয়গিরির প্রকৃতি ও কার্য্য আলোচনা করা গেল। আগ্নেয়গিরির উৎক্ষেপ একটি ভয়ঙ্কর নৈসর্গিক ব্যাপার। উহা হইতে অর্দ্ধগলিত প্রস্তর, ধাতু প্রভৃতি বেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। বোধ হয়, ভূ-গর্ভ উত্তাপে গলিত ঐরূপ দ্রব্যাদিতে পরিপূর্ণ। কোন প্রবল উৎক্ষেপণী শক্তি দ্বারা উহারা ভূ-গর্ভ হইতে উৎক্ষিপ্ত হয়। ঐ শক্তি কি এবং কিরূপে উহার উৎপত্তি হয়, তদ্বিষয় সম্যক্ জানা যায় নাই। উহা যাহাই হউক, এতদ্দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের বিস্তর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে। বৃষ্টি, জল, বাতাস প্রভৃতি দ্বারা উচ্চ ভূভাগ ক্ষয়িত হইতেছে এবং ঐ ক্ষয়িত মৃত্তিকাদি দ্বারা নিম্নস্থান পূর্ণ হইয়া সমুদ্র হইতে নূতন ভূভাগ উৎপন্ন হইতেছে। জলের ও স্থলের এইরূপে উচ্চ হইতে নিম্নে গমনের উদাহরণ প্রচুর পাওয়া যায়। আগ্নেয়গিরি দ্বারা ভূমির নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে গমন দেখা যায়। ভূ-গর্ভের সামগ্রী ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া নূতন নূতন ভূভাগ উৎপাদন করিতেছে।

৪ § ভূমিকম্প ও ভূ-পঞ্জরের উদ্‌গমন ও অধোগমন।

৯০। **ভূমিকম্পের উৎপত্তি ও প্রকৃতি।** ভূমিকম্প কাহাকে বলে, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। বাস্তবিকই উহা ভূমির কম্পন। কোন এক স্থানে কোন কারণবশতঃ উৎপন্ন হইয়া উহা চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়।

আগ্নেয়গিরির সহিত ভূমিকম্পের বিশেষ সম্বন্ধ দেখা যায়। বস্তুতঃ অধিকাংশ স্থলে আগ্নেয়গিরির উৎক্ষেপের প্রাক্কালে ভূমিকম্প সংঘটিত হইয়া থাকে। বোধ হয়, ভূ-পঞ্জরে ফাট বা গহ্বর উৎপাদন করিয়া ভূ-গর্ভস্থিত সামগ্রীর উৎক্ষেপের চেষ্টা হওয়াতে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। কিন্তু আহিতাগ্নি আগ্নেয়গিরি না থাকিলে ভূমিকম্প হয় না, এরূপ বলা সঙ্গত নহে। ভারতে এরূপ গিরি এক্ষণে বর্ত্তমান নাই। অথচ আমরা সময়ে সময়ে ভূমিকম্প অনুভব করিয়া থাকি। অনেকে মনে করেন যে, আরাকাণ-পর্ব্বতশ্রেণীতে পূর্ব্বলিখিত পুপ্পাহুঙ্গ ও হশুত্রংশান নামক বীতাগ্নি আগ্নেয়গিরির উৎক্ষেপের চেষ্টাতে বঙ্গদেশে ভূমিকম্প হইয়া থাকে।

অনেকস্থলে ভূমিকম্পের পূর্ব্বে রাজপথে শকট গমনে ঘর্ঘর শব্দের ন্যায়, বিকট শব্দ শ্রবণগোচর হয়। সন ১২৯২ সালে পাবনা প্রভৃতি স্থানে যে পুনঃ পুনঃ ভূমিকম্প হয়, তাহাতে এরূপ শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাইয়া অনেক লোক ভূমিকম্প-প্রকোপ হইতে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে পারিয়াছে। দীর্ঘ লৌহ কিম্বা কাষ্ঠদণ্ডের এক প্রান্তে আঘাত করিলে, যেমন সেই আঘাত অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত চালিত হয়, তদ্রূপ, ভূ-পঞ্জরের কোন স্থান হঠাৎ বসিয়া গেলে কিম্বা ঊর্দ্ধে উন্নমিত হইলে, তথা হইতে সংক্ষোভ চারিদিকে প্রধাবিত হয়। নিম্নের কয়েকটি বিবরণ হইতে ভূমিকম্পের প্রকৃতি সম্যক্ বুঝা যাইবে।

সন ১২৮৮ সালের পৌষমাসে যে প্রবল ভূমিকম্প হয়, তাহা ভারতের অধিকাংশ স্থলে অনুভূত হইয়াছিল। বাঙ্গালাদেশে গয়া, হাজারিবাগ,২৪ পরগণা এবং সুমাত্রা,কলিকট প্রভৃতি প্রায় সর্ব্বত্র বেশ জানা গিয়াছিল। রামড়িদ্বীপের কর্দ্দমোৎক্ষেপী আগ্নেয়গিরির তৎকালে উৎক্ষেপ হয়। ঐ ভূমিকম্প উত্তরদক্ষিণে ১,৬০০ মাইল এবং

পূর্ব্বপশ্চিমে ১,৫০০ মাইল স্থানে অনুভূত হয়। বিভিন্ন স্থানের ভূমিকম্পের কাল ও গৃহাদি ভাঙ্গিবার দিক্ নিরূপণ করিয়া ওল্ডহাম সাহেব স্থির করিয়াছেন যে, উক্ত ভূ-কম্প ভূ-পৃষ্ঠ হইতে ৩—৫ ক্রোশ মধ্যে উৎপন্ন হইয়া প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ২,০০০ ফুট বেগে ধাবিত হইয়াছিল।

সন ১২৯২ সালের আষাঢ় মাসে বঙ্গদেশে আর এক ভূমিকম্প অনুভূত হয়। উহা ছোটনাগপুর, বেহার, সিকিম, ভূটান, আসাম, মণিপুর ও ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থান লইয়া প্রায় ২,৩০,৪০০ চতুরস্র মাইল স্থানে জানা যায়। ঐ ভূমিকম্পে রামপুর, বগুড়া, শেরপুর, মৈমনসিংহ, ঢাকা, পাবনা প্রভৃতি স্থানে অসংখ্য অসংস্য বাটী ভূমিসাৎ ও বিস্তর প্রাণী বিনষ্ট হয়। সেরাজগঞ্জ, জামালপুর প্রভৃতি স্থানে ভূমিতে বড় বড় ফাট উৎপন্ন হইয়াছিল। মৈমনসিংহ জেলার শেরপুর নামক স্থানে কোন কোন ফাট হইতে বালুকা, জল ও ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ড উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। আগ্নেয়গিরির উৎক্ষেপের সহিত ভূমিকম্পের কতদূর সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ আছে, তাহা এই ঘটনা হইতে পাঠকবর্গ অনায়াসে বুঝিতে পারিয়াছেন। বিভিন্ন স্থানে ঐ ভূমিকম্পের কাল এবং গৃহাদি ভাঙ্গিবার দিক্ দেখিয়া নিরূপিত হইয়াছে যে, ঢাকা হইতে ১২।১৩ ক্রোশ উত্তরপশ্চিম স্থানে উহার উৎপত্তি-স্থল। উহা ভূ-পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৪৫ মাইল নিম্নে ছিল। ঐ ভূমিকম্পের ২১ দিবস অগ্রে তথায় একবার ভূমিকম্প হয়। তাহাও নিতান্ত অল্প প্রবল নহে। পরে শ্রাবণ মাসের উপরি উক্ত প্রধান ভূমিকম্পের পর ক্রমান্বয়ে ৫ দিবস কাল প্রতিদিবস দুই তিন বার করিয়া সামান্য কম্পনে জনসাধারণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল।

গত সন১২৯২ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে একদিবস রাত্রি প্রায় ২॥০ টার সময় কাশ্মীরে এক ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। উহা কাশ্মীরের সর্ব্বত্র, সিমলা, লাহোর, পেশবার ইত্যাদি স্থানে অনুভূত হয়। উহাতে বিস্তর

ধনপ্রাণ বিনষ্ট হয়। প্রধান ভূমিকম্পের পরও অনেক দিবস পর্য্যন্ত সামান্য সামান্য ভূমিকম্প হয়। একদিবস ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৩৩টি পৃথক্ ভূমিকম্প হয়। গৃহাদি ভাঙ্গিয়া পড়াতে ৩,০০০ সহস্রের বেশী লোকের মৃত্যু হইয়াছে। অশ্বগবাদি পশুর মৃত্যুসংখ্যা আরও অধিক। বরমূলা নামক স্থানে নদীর ধারে অনেকগুলি ফাট উৎপন্ন হইয়াছিল। তন্মধ্যে কয়েকটি ৬০ হস্ত বিস্তৃত ও সিকি মাইল দীর্ঘ ছিল। কোন কোনটি হইতে জল এবং সরু বালুকা উৎক্ষিপ্ত হয়। ভূমিকম্পের সঙ্গে সঙ্গে গভীর গর্জ্জন শুনা গিয়াছিল। এককালে যেন শত কামানের আওয়াজ হইয়া উঠিল।

কিন্তু সন১১৬২ সালের কার্ত্তিক মাসে লিসবন নগরে যে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়, তাহার তুলনায় উপরি বর্ণিত ভূমিকম্প কিছুই নহে। বজ্রগর্জনের ন্যায় ভীষণ শব্দ হইয়া এক ভূমিকম্প হয়, তাহাতে নগরের প্রায় সমস্ত ধ্বংস হইয়াছিল। ৬ মিনিটের মধ্যে ৬০,০০০ হাজার লোকের প্রাণ বিনষ্ট হয়। ভূমিকম্প হওয়াতে নিকটবর্ত্তী সমুদ্র হইতে প্রায় ৩০। ৩২ হাত উচ্চ এক প্রকাণ্ড ঢেউ আসিয়া নগরকে প্লাবিত ও ধ্বংস করিয়াছিল। ইয়ুরোপের চতুর্গুণ বড় আয়তন স্থানে ঐ ভূমিকম্প অনুভূত হইয়াছিল।

৯১। **ভূমিকম্পদ্বারা ভূ-পঞ্জরের পরিবর্ত্তন।** ভূমিকম্পের কার্য্য নগরধ্বংস ও প্রাণিবিনাশে পর্য্যবসিত হয় না। উহাদ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের বিস্তর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। সন১২২৯ সালে চিলি দেশের ভূমিকম্পে আমেরিকার প্রায় এক সহস্র মাইল দীর্ঘ উপকূল উন্নমিত হইয়াছিল। সন১২২৬ সালের আষাঢ়মাসে এদেশে যে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়, তাহা কচ্ছ প্রদেশে বিশিষ্ট প্রবলরূপে উপলব্ধ হয়। উহাতে সিন্ধুনদের পূর্ব্বপার্শ্বস্থিত সিন্দ্রিনামক গ্রাম ও দুর্গ এবং রণ্ নামক স্থানের কিয়দংশ শস্যক্ষেত্রাদি সহ বসিয়া যায়। তাহাতে সমুদ্র-

জল আসিয়া তাহাকে প্লাবিত করে। যখন রণ্ বসিয়া যায়, তাহার নিকটবর্ত্তী কচ্ছের উত্তর ৫০ মাইল দীর্ঘ এবং ১৫ মাইল প্রশস্ত একটি স্থান বৃহৎ পুষ্করিণীর বাঁধের ন্যায় হঠাৎ উন্নমিত হয়। ঐ বাঁধকে অদ্যাবধি লোকে আল্লাবাঁধ বলে।

ইতিপূর্ব্বে ভূমধ্য-সাগরস্থ ফার্ডিনাণ্ড নামক আগ্নেয়গিরির সমুদ্রজল হইতে হঠাৎ উত্থান বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপে ভূমিকম্পের সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন স্থান উত্থিত এবং কোন কোন স্থান অধোগত হইয়া থাকে।

৯২। **ভূ-পঞ্জরের অধোগমন।** ভূমিকম্পের সঙ্গে সঙ্গে ভূমির যে সমস্ত উদ্‌গমন ও অধোগমন ঘটে, তৎসমুদয় হঠাৎ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন, অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে যে কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভূভাগ কোন অজ্ঞাত কারণবশতঃ উদ্গত ও অধোগত হইতেছে, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। আমাদিগের পৃথিবীকে আপাততঃ মনে হয় যে, বুঝি চিরকাল উহা এইভাবে বিরাজ করিতেছে। চিরকালই বুঝি হিমালয় উন্নতমস্তকে ভারতের শিরাদেশে শোভা পাইতেছে। চিরকালই বুঝি বঙ্গদেশ শ্যামলশস্যশালী থাকিয়া বাঙ্গালির নিবাসভূমি হইয়া রহিয়াছে। চিরকালই বুঝি কলিকাতা নগরী একই ভাবে মনুষ্য জনাকীর্ণ ও বোম্বাই সহর চিরকালই বুঝি ভারতের পশ্চিমে অবস্থিত রহিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক নগর, দেশ, মহাদেশের উপর প্রতিনিয়ত অল্পে অল্পে কত বিষয়ের কত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সমুদায় পরিবর্ত্তন কেবল জলদ্বারা সংসাধিত হইতেছে না। ভূ-গর্ভের কোন উৎক্ষেপণী শক্তিদ্বারা বিস্তীর্ণ বিস্তীর্ণ ভূভাগ ধীরে ধীরে উদ্গত ও অধোগত হইতেছে। এতদ্বিষয়ের কয়েকটি প্রমাণ এখানে দেওয়া যাইতেছে।

সন ১২৪২ সাল হইতে ৫ বৎসর ধরিয়া কলিকাতার দুর্গ মধ্যে এক

গভীর কূপ খনন করা হয়। তাহাতে ভূমির ৩০ ফুট হইতে ৫০ ফুট নিম্নের মধ্যে সুন্দরী বৃক্ষাদির বড় বড় শিকড় ও উদ্ভিজ্জাবশেষ এবং আবার ৩৮০ফুট নিম্নে জন্তুর বিনষ্ট হাড় (২০চিত্র), শম্বুক ও কাষ্ঠ ইত্যাদি পাওয়া যায়। কলিকাতা নগরী এক্ষণে সমুদ্র-জলসীমা হইতে ১৮ ফুট মাত্র উচ্চ। অতএব বুঝা যাইবে যে, কলিকাতার মৃত্তিকা ৩০ ফুট তুলিয়া ফেলিলে, তাহা ১২ ফুট এবং ৩৮০ ফুট পর্য্যন্ত তুলিয়া ফেলিলে ৩৬২ ফুট গভীর সমুদ্র-জলে প্লাবিত হইবে। যে সমস্ত বৃক্ষের কাষ্ঠ ও জন্তুর হাড় পাওয়া গিয়াছে, তৎসমুদয় কখনও সমুদ্রজলের অত নিম্নে জন্মে নাই। এককালে উক্ত স্থান সমুদ্রের উপরে থাকিয়া উদ্ভিজ্জাদির ও প্রাণিবর্গের আবাসভূমি ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। তবেই দেখ, পুরাতন ভূ-পৃষ্ঠ অন্ততঃ ৩৬২ ফুট বা ২৪১ হাত বসিয়া গিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শুদ্ধ কলিকাতায় নহে, কলিকাতার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ২৪ পরগণা, যশোহর প্রভৃতি জিলায় সময়ে সময়ে যে পুষ্করিণী খনন করা গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, ৩০ ফুট বা ২০ হাত নিম্নে উদ্ভিজ্জাবশেষবিশিষ্ট এক স্তর দেখা যায়। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, দক্ষিণ বঙ্গের অধিকাংশ স্থান ধীরে ধীরে বসিয়া গিয়াছে। ঐ ভূ-ভাগের অধোগমনের সঙ্গে সঙ্গে নদী-বাহিত পলি-সঞ্চয় কার্য্য চলিতেছে। এইরূপে বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ বর্ত্তমান স্থান নদীর পলিদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে।

২০ চিত্র। প্রোথিত জন্তুর বিনষ্ট হাড়।

কয়েক বৎসর হইল, বোম্বাই সহরে কোন কার্য্যবশতঃ খাদ করিবার সময় সমুদ্রের জোয়ারের জলের সীমার প্রায় ৩০ ফুট নিম্নে এক শত বিঘার জমির মধ্যে প্রায় ৪০০ শত বৃক্ষের মূলদেশ ও কাহার কাহার কিয়দংশ কাণ্ড দেখা গিয়াছে। তন্মধ্যে অনেকগুলি খদির-বৃক্ষ ও কয়েকটি সেগুণ বৃক্ষ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। ঐ দুইটি বৃক্ষ সমুদ্রের জলসীমার মধ্যে কুত্রাপি জন্মিতে দেখা যায় না। অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ঐ স্থান পূর্ব্বে খদির ও সেগুণের বন ছিল। কালক্রমে অন্ততঃ ৩০।৩২ ফুট অধোগত হইয়াছে। অনেকগুলি বৃক্ষ যেরূপ অবস্থায় জন্মিয়াছিল, তদবস্থায় এবং অপর কয়েকটি ভূমিশায়ী ছিল। শেষোক্ত বৃক্ষের মধ্যে একটির দৈর্ঘ্য ৩০ হাত ও পরিধি ৩ হাত ছিল। ভূমির অধোগমনবশতঃ বৃক্ষাদির মূলদেশ কিরূপ দেখা যায়, তাহা নিম্নের চিত্র হইতে বুঝা যাইবে।

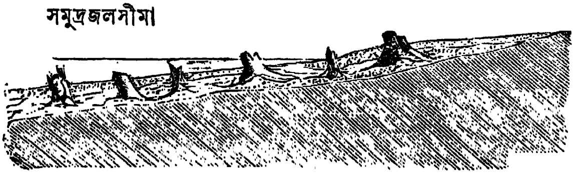

২১ চিত্র। সমুদ্রজলে নিমগ্ন-বন।

ভারতসমুদ্রের মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ, চেগোদ্বীপ প্রভৃতি অনেকগুলি দ্বীপ প্রবালনামক একপ্রকার সমুদ্রকীটের কঙ্কালে গঠিত। পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন যে, ঐ কীট কখন ৮০।১০০ হাত সমুদ্রজলের বেশী নিম্নে বাস করে না। সচরাচর তাহারা ৬০ হাত জলের মধ্যে বাস করে। অসংখ্য অসংখ্য প্রবালকীট একত্রে জন্মিয়া একত্রে মরাতে, তাহাদিগের কঙ্কালসমষ্টিতে ঐ সমস্ত দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু অনেক প্রবালদ্বীপ এক্ষণে ১০০ হাত জলের অনেক নীচে দেখা যায়। শুদ্ধ

ইহাই নহে, অনেক প্রবালদ্বীপের বাহিরে সমুদ্রজল ঋজুভাবে অতীব গভীর দেখা যায়। ঐ সমস্ত দ্বীপের অধোগমন স্বীকার না করিলে, সমুদ্রজলের অত নীচে উহাদিগের অবস্থান সম্ভবপর হয় না। যে ভূমির বা দ্বীপের উপর প্রথমে প্রবাল জন্মিতে আরম্ভ করে, তাহা বেশী নিম্নে ছিল না; কিন্তু কালক্রমে উহাদিগের অধোগমন হওয়াতে, উহারা গভীর জলে নিমগ্ন দেখা যায়। প্রবালদ্বীপের বিষয় পরে বিবৃত হইবে।

৯৩। **ভূ-পঞ্জরের উদ্গমন।** উপরে ভূ-পঞ্জরের অধোগমনের কয়েকটি প্রমাণ দেওয়া গেল। এক্ষণে উহার উদ্গমনের প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে।

অসংখ্য প্রকার শম্বুক ও ঝিনুক আছে, যাহারা কেবল সমুদ্রে জন্মে, নদীর কিম্বা অন্য স্বাদু জলে আদৌ জন্মে না। এইরূপ সমুদ্রজ শম্বুকাদির খোলা ভারতের উপকূলের অনেক উচ্চে দেখিতে পাওয়া যায়। বালুকা, কাঁকর প্রভৃতি বিশেষভাবে সজ্জিত দেখিলে যেমন তাহা পূর্ব্বে নদীর গর্ভ ছিল, বলিয়া অনুমান করিতে পারা যায়, তদ্রূপ জলের তরঙ্গাভিঘাতবশতঃ ভূ-পৃষ্ঠের উপর তাহার চিহ্ন দেখিয়া কোন স্থান সমুদ্রতট ছিল কি না, তাহা অনায়াসে নিরূপণ করিতে পারা যায়। এই প্রকার চিহ্ন, স্থানে স্থানে জাহাজাদির ভগ্নাবশেষ ও সমুদ্রজ শম্বুকাদির খোলা সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে অনেক উচ্চে দেখিয়া স্থির করা যায় যে, ভারতের উপকূল ক্রমশঃ সমুদ্র হইতে উত্থিত হইতেছে। উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদের দক্ষিণ পাড় এক্ষণে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ২০।৩০ ফুট উচ্চ। কিন্তু তথায় সমুদ্রজ শম্বুকাদির খোলা দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির এবং তথা হইতে ১৭ মাইল পূর্ব্বোত্তর-স্থিত কনারকের মন্দির পূর্ব্বে সমুদ্রতটে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে ঐ দুইটি মন্দির সমুদ্রজলসীমা হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিত

দেখা যায়। পুরীর মন্দির এক্ষণে সমুদ্র হইতে প্রায় $\frac{২}{৩}$ মাইল, এবং কনারকের মন্দির প্রায় ১$\frac{১}{২}$ মাইল ভিতরে দেখা যায়।

এইরূপ ধীরে ধীরে ভূ-পঞ্জরের অধোগমন ও উদ্‌গমন শুদ্ধ ভারতে নহে, পৃথিবীর নানাস্থানে লক্ষিত হইতেছে। ইয়ুরোপে স্থইডেনের উত্তরাংশ ক্রমশঃ উদ্‌গমন করিতেছে। পূর্ব্বে সমুদ্রতটে প্রস্তর চিহ্নিত করা হইয়াছিল, এক্ষণে উহাকে সমুদ্রজলসীমা হইতে অনেক উচ্চে দেখা যায়। আবার উহার দক্ষিণাংশ ক্রমশঃ অধোগত হইতেছে। গ্রীণলাণ্ড দেশের পশ্চিম উপকূলের প্রায় ৬০০ শত মাইল স্থান ধীরে ধীরে অধোগত হইতেছে। পূর্ব্বে যে সমস্ত খুঁটীতে নৌকা বাঁধা যাইত, তাহাদিগকে এক্ষণে সমুদ্রজলে নিমগ্ন দেখা যায়। অনেক গৃহাদি এইরূপে সমুদ্রজলের ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে। এমন কি, পণ্ডিতেরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকা কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চে উঠিয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্রবালকীট সমুদ্রজলের নীচে জন্মিয়া থাকে। কিন্তু যাবা ও তন্নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহের অনেক স্থানে প্রবালকীট-নির্ম্মিত ভূ-ভাগ সমুদ্রজলসীমা হইতে এক্ষণে অনেক উচ্চে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমুদায় প্রমাণদ্বারা জানা যায় যে, ভূ-পঞ্জরের স্থানে স্থানে অধোগত ও স্থানে স্থানে উদ্‌গত হইতেছে।

কিন্তু এমন কঠিন স্থলভাগের উদ্‌গমন ও অধোগমন সহজে বিশ্বাস হয় না। ভূ-পঞ্জর ত নরম নমনীয় বস্তু নহে যে, কোন স্থান স্ফীত ও কোন স্থান কুঞ্চিত হইবে। অনেকে এজন্য ভাবিতে পারেন যে, সমুদ্রজলের হ্রাসবৃদ্ধিবশতঃ ভূভাগের অধোগমন ও উদ্‌গমন বোধ হয়। বাস্তবিক, যদি কোন কারণবশতঃ সমুদ্রের গভীরতার হ্রাস হয়, তাহা হইলে অদ্য যাহা সমুদ্রমধ্যে আছে, ওরূপ ঘটিলে তাহা ভূভাগে

পরিণত হইবে এবং অদ্য যাহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে অল্প উচ্চে আছে, তাহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে তখন অনেক উচ্চে দেখা যাইবে। অন্যপক্ষে, কোন কারণবশতঃ যদ্যপি সমুদ্রের গভীরতার বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে অদ্য যাহা সমুদ্রতট আছে, তাহা সমুদ্রজলে নিমগ্ন হইবে। এরূপ অনুমান সত্য কি না, তাহা বিচার করা যাউক। মনে কর, একটি পুষ্করিণীর কোন স্থানে এক খাদ করিয়া পুষ্করিণীটি গভীর করা গেল। ইহাতে ঐ পুষ্করিণীর জলের গভীরতা সর্ব্বত্র অল্পাধিক কমিয়া যাইবে এবং উহার চারিদিকেই পঙ্ক বাহির হইয়া পড়িবে। অর্থাৎ সমুদ্রের সহিত ঐ পুষ্করিণীর তুলনা করিলে, সমুদ্রের সর্ব্বত্রই উপকূল উদ্‌গত দেখা যাইবে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, পৃথিবীতে সমুদ্র নামে একটিমাত্র প্রকাণ্ড জলরাশি আছে। কোন কারণবশতঃ ঐ জলরাশির জল কমিলে, সর্ব্বত্রই উপকূল উচ্চে উঠিতে দেখা যাইত। কিন্তু সর্ব্বত্রই ত ভূমি উদ্‌গত দেখা যায় না। দেখ, বোম্বাই সহর অধোগত আর তাহার নিকটবর্ত্তী ভারতের পশ্চিম উপকূল উদ্‌গত দেখা যাইতেছে। সুইডেনের একাংশ উদ্‌গত ও অপরাংশ অধোগত হইতেছে। সমুদ্রের গভীরতার হ্রাস হইলে, উহা এক এক স্থানে না হইয়া সর্ব্বত্র হইত। অন্য পক্ষে মনে কর, মৃত্তিকা নিক্ষেপ পূর্ব্বক পুষ্করিণীর কোন স্থান পূর্ণ করিয়া দেওয়া গেল। তাহাতে ঐ পুষ্করিণীর জল পুরাতন সীমা চারিদিকেই অতিক্রম করিবে। অর্থাৎ সমুদ্রের জল কোন কারণবশতঃ বৃদ্ধি হইলে, তাহা সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইত। সমুদ্রের সমুদায় উপকূলই অধোগত হইতে দেখা যাইত। এতদ্ভিন্ন, এত বড় প্রকাণ্ড সমুদ্রের জলের হ্রাস বা বৃদ্ধি হইতে পারে, এমন কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কোথা হইতে এত প্রভূত জল আসিবে? আর কোথায়ই বা এত প্রভূত জল চলিয়া যাইবে?

অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, স্থলভাগের অধোগমন ও উদ্গমন ঘটিতেছে।

৯৪। সংক্ষিপ্তসার। এই অনুচ্ছেদে প্রথমে ভূমিকম্পের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ভূমিকম্পের প্রকৃত কারণ কি, তাহা এখনও সম্যক্ নিরূপিত হয় নাই। তবে আগ্নেয়গিরির উৎক্ষেপের সহিত ইহার সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন স্থানে কোন ভূমিকম্প অনুভব করিবার কাল হিসাব করিয়া ও গৃহাদি ভাঙ্গিবার দিক্ নিরূপণ করিয়া সেই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থান নির্ণীত হইয়া থাকে। ভূমিকম্পবশতঃ গ্রাম নগর ধ্বংস ব্যতীত সময়ে সময়ে ভূ-পঞ্জরের স্থানে স্থানে হঠাৎ উত্থিত এবং অধঃপতিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদিগের অদৃশ্যভাবে ধীরে ধীরে পৃথিবীর নানাস্থানের ভূভাগ কোথাও বা উদ্গত এবং কোথাও বা অধোগত হইতেছে। আগ্নেয়গিরির উৎক্ষেপে এবং ভূমিকম্পে ভূমি হঠাৎ উন্নমিত বা অধঃপতিত হইতে দেখা যায়। যে প্রবল শক্তিদ্বারা বিস্তীর্ণ ভূভাগ কম্পিত হয় বা আগ্নেয়গিরির উৎক্ষেপ ঘটে, তদ্দ্বারা ভূমির অধোগমন বা উদ্গমন সম্ভাবিত হইতে পারে। কিন্তু এমন কোন্ শক্তি ভূ-গর্ভে কার্য্য করিতেছে, যদ্দ্বারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভূভাগ ক্রমে অল্প অল্প উত্থিত বা পতিত হইতে পারে? ইহা যে শক্তিই হউক, ইহার মূলকারণ ভূ-গর্ভের নিরতিশয় তাপ, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এতদ্দ্বারাই কোন কোন ভূ-ভাগ উন্নমিত হইয়া পাহাড় পর্ব্বতের রূপ ধারণ করিয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

ভূ-পঞ্জর।

৯৫। আমরা পূর্ব্ব কয়েক অধ্যায়ে বায়ু ও জলের বিষয় আলোচনা করিয়াছি। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ এবং ভূ-পঞ্জর কোন্ কোন্ সামগ্রীতে গঠিত, এক্ষণে তদ্বিষয় বিচার করা যাইবে।

৯৬। **প্রস্তর।** প্রস্তর-শব্দে আমরা সামান্যতঃ কঠিন শিলাখণ্ডকে বুঝি। কিন্তু ভূ-বিজ্ঞান শাস্ত্রে প্রস্তর-শব্দের অর্থ নিতান্ত বিস্তৃত। বালুকা, কোমল পঙ্কবৎ মৃত্তিকা হইতে কঠিন শিলা পর্য্যন্ত সমুদায়, প্রস্তর শব্দে বুঝা যায়।

বঙ্গদেশের যে কোন স্থানের ভূ-পৃষ্ঠ দেখিলে জানা যায় যে, ভূমির সর্ব্ব উপরে বালুকা, কর্দ্দম, পলি ইত্যাদি মৃত্তিকা। ঐ মৃত্তিকাতে বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদসমূহ জন্মিতেছে। কিন্তু ঐ মৃত্তিকা হইতে বালেশ্বরের পাথর, শ্লেট-প্রস্তর, অভ্র কিম্বা আগ্নেয়গিরির নিঃস্রব কিম্বা পাথুরিয়া কয়লা এবং চাখড়ি, কত ভিন্ন। বাস্তবিক, উৎপত্তি-সম্বন্ধে যাবতীয় প্রস্তরকে জলজ বা স্তরীভূত, জীবজ এবং অগ্নিজ, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহাদিগের বিষয় ক্রমান্বয়ে বিবৃত হইতেছে।

৯৭। **মৃত্তিকা।** বিভিন্ন স্থানের মৃত্তিকা বিভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের সমবায়ে প্রস্তুত হইয়াছে। কোন মৃত্তিকা হয়ত কেবল বালুকাময়, কোন মৃত্তিকা আটাল, কোনটি বা চূর্ণময় এবং কোনটি বা উদ্ভিদ ও প্রাণিগণের নষ্টাবশেষময়। বালুকা সরু

কিম্বা মোটা, নির্ম্মল, আরক্ত বা হরিদ্রাভ দেখা যায়। পর্ব্বতাদির নিকটস্থ নদী প্রভৃতিতে বালুকা খুব বড় বড় হইয়া থাকে। কোণ-বিশিষ্ট ছোট কঠিন শিলাখণ্ডকে 'খোয়া' বলা যায়। ঐ খোয়ার কোণগুলি ঘর্ষণবশতঃ বিলুপ্ত হইয়া মসৃণ হইলে, উহাকে নুড়ী বলে। বালুকা-কণাসমূহ একত্র দৃঢ়সম্বদ্ধ হইলে, 'বেলে পাথর' হয়। সূত্রধরেরা বাটালি প্রভৃতি যন্ত্রাদি বেলেপাথরের শাণে ঘষিয়া ধারাল করে।

আটাল মৃত্তিকাকে সামান্যতঃ এঁটেল মাটি বলে। উহা বালির ন্যায় পরস্পর আল্‌গা নহে। এই মৃত্তিকাদ্বারা কুম্ভকারেরা তাহাদের বাসন প্রস্তুত ও প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। আটাল মৃত্তিকাকে কখন কখন কর্দ্দম বলা যায়। কর্দ্দমের সহিত বালুকা ও অভ্রচূর্ণ সচরাচর মিশ্রিত থাকে। চীনের বাসন ও দোয়াত ভাল আটাল মৃত্তিকা হইতে প্রস্তুত হয়। মোটা বালুকাময় আটাল মৃত্তিকা হইতে ইষ্টক প্রস্তুত হয়।

ঝিনুক, শম্বুক প্রভৃতির খোলা এবং ঘুটিং পোড়াইয়া আমরা চূণ প্রস্তুত করিয়া থাকি। ইহাতে সহজেই জানা যাইতেছে যে, ঐ সমুদয় চূর্ণময়। অনেক স্থলে আটাল মৃত্তিকাতে ঝিনুক প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ এবং ঘুটিং দেখা যায়। চূর্ণময় মৃত্তিকাতে অল্পাধিক বালুকা ও অন্যবিধ মৃত্তিকা মিশ্রিত থাকে। চা-খড়ি এবং মর্ম্মর প্রস্তরও চূর্ণময়।

৯৮। **স্তরীভূত প্রস্তর।** বিভিন্ন স্থানের মৃত্তিকা পরীক্ষা করিলে আমরা উপরি বর্ণিত কয়েকপ্রকার মৃত্তিকা দেখিতে পাই। কিন্তু ঐ মৃত্তিকার নিম্নের ভূ-ভাগ পর্য্যবেক্ষণ করিলে, পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ প্রস্তর দৃষ্ট হয়।

নদীর ধারে, সমুদ্রের তটে, পুষ্করিণী কিম্বা কূপ খনন করিলে, পাহাড় কাটিয়া নিম্ন পথ করিলে, প্রস্তরকে প্রায়ই স্তরে স্তরে একটির

পর আর একটি সজ্জিত দেখা যায়। পুষ্করিণী খননকালে যেরূপ স্তর দেখা যায়, তাহা নিম্নের চিত্র দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে। স্তরে স্তরে সাজান থাকে বলিয়া ঐ সমুদয়কে স্তরীভূত প্রস্তর বলে।

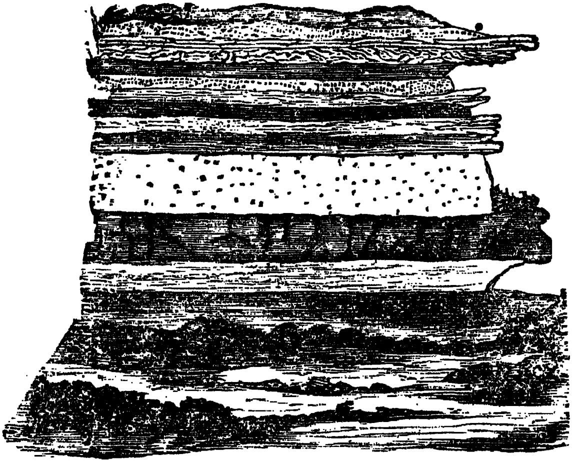

২২ চিত্র। স্তরীভূত প্রস্তরের স্তর।

৯৯। জীবাবশেষ। নদী প্রভৃতিদ্বারা যেমন বালুকা, কর্দ্দম, নুড়ী আনীত হইয়া স্তর উৎপন্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ বৃক্ষলতাদির ভগ্ন শাখা, কাণ্ড প্রভৃতি এবং মৃত প্রাণিশরীরও তদ্দ্বারা বাহিত হইয়া পলির স্তরের সহিত নদীর মোহানায় সঞ্চিত হয়। ইহাদিগের উপর আবার অন্য পলি পতিত হওয়াতে, বৃক্ষলতাদি ও প্রাণিবর্গের দেহসমূহ পলির মধ্যে প্রোথিত হইয়া যায়। এইরূপে কেবল সমুদ্রে নহে, যদি নদী কোন বিল বা হ্রদ দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে তথায় নদীর জলের স্রোত বন্ধ হওয়াতে, সেই সেই স্থানেও পলির সহিত জীবাদির দেহ সঞ্চিত হইবে। অবশ্য এসকল স্থলে পশু-

পক্ষ্যাদির রক্তমাংস এবং তরুলতাদির সরস কোমল অংশসমুদয় পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু উহাদিগের স্ব স্ব দেহের কঙ্কাল ও কঠিনাংশ অল্পাধিক পরিমাণে বিকৃত অবস্থায় থাকিবে। কোথাও কোথাও বা বালুকা কর্দ্দমের মধ্যে উহাদিগের ছাপমাত্র দেখা যাইবে। জীবগণের দেহের এইরূপে প্রোথিত ছাপ এবং নষ্টাবশেষকে 'জীবাবশেষ' বলা যায়। আগ্নেয়গিরির নিঃস্রবে কখন জীবাবশেষ থাকিতে পারে না। কেবল জলজ প্রস্তরেই জীবাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য এই প্রস্তরকে জীবাবশেষধারী প্রস্তরও বলা যাইতে পারে।

১০০। **প্রস্তরের কাল নির্ণয়।** আমরা কতকগুলি স্তর সাজান দেখিয়া নিশ্চয় বলিতে পারি যে, ঐ স্তরসমূহের মধ্যে কোন্ স্তরটি অগ্রে এবং কোন্ স্তরটি কাহার পরে উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ণিত ১৩ চিত্রের পরীক্ষায় দেখা যায় যে, বালুকাস্তরের পর কর্দ্দমস্তর পতিত হইয়াছে। তদ্রূপ ২২ চিত্রের নিম্নের স্তরগুলি উপরের স্তরগুলির অগ্রে উৎপন্ন হইয়াছিল, বলিতে পারা যায়। অতএব এইরূপ স্তরের পর্য্যায়-বিন্যাস দেখিয়া দুইটি বিভিন্ন স্তরের কোন্‌টি অগ্রে এবং কোন্‌টি পরে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয়রূপে নিরূপিত হয়।

কিন্তু স্তরসমুদয় সর্ব্বত্র সমতলভাবে একটির উপর আর একটি সাজান দেখা যায় না। অবশ্য যখন নদীদ্বারা পলি বাহিত হইয়া সঞ্চিত হইয়াছিল, তখন স্তরসমুদয় সমতল ছিল। ভূ-পৃষ্ঠের উদ্গমন ও অধোগমন বশতঃ স্থানে স্থানে প্রস্তরসমূহের সমতলতা বিচলিত হইয়া যায়। এইরূপে প্রস্তর-স্তরসমূহ কোথাও বা ঊর্দ্ধে কুঞ্চিত, কোথায় বা অধঃকুঞ্চিত, কোথাও বা ঢালু হইয়া পড়িয়াছে। নিম্নের ২২ চিত্রে প্রস্তর-স্তরের কুঞ্চিত ও ভগ্নাবস্থা দেখান হইয়াছে। কিন্তু এসকল স্থলেও প্রস্তরের পর্য্যায়-বিন্যাস দেখা যায়।

প্রত্যেক স্তরের উপকরণগুলি প্রায় সর্ব্বত্রই একরূপ। কোন বালুকাস্তর অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া একটি প্রদেশে বিস্তৃত থাকিতে পারে। কিন্তু সর্ব্বত্রই উহার সেই একপ্রকার বালুকা দৃষ্ট হইবে। তদ্রূপ, কোন আটাল মৃত্তিকার স্তরের সর্ব্বত্রই একই প্রকার আটাল মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যাইবে। যদি দুইটি দূরবর্ত্তী বিভিন্ন স্থানের প্রস্তরের একই প্রকার উপকরণ দেখা যায়, তাহা হইলে ঐ দুইটি স্তর যে এককালে এবং একই অবস্থায় উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা জানা যায়। মনে কর, কোন গ্রামের এক পার্শ্বে এক পুষ্করিণী খননকালে ভূমির দশ হাত নীচে আটাল মৃত্তিকার এক স্তর দেখা গেল। ঐ মৃত্তিকার হরিদ্রাভ বর্ণ এবং উহাতে ছোট কাঁকর ও ঘুটিং রহিয়াছে। পরে মনে কর, গ্রামের অপর পার্শ্বে উক্ত বর্ণের আটাল মৃত্তিকার একটি স্তর দেখা গেল। ইহাতেও ঠিক প্রথমোক্ত স্তরের ন্যায় কাঁকর ও ছোট ছোট ঘুটিং রহিয়াছে। এরূপ হইলে, ঐ দুইটি স্তর যে এক এবং এককালে একই প্রকার অবস্থায় উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা অসুঙ্গত নহে।

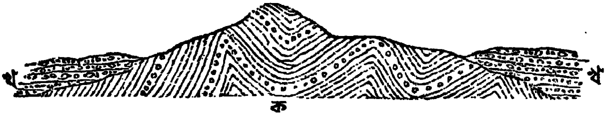

২৩ চিত্র। ক স্তরগুলি কুঞ্চিত হইয়াছে, খ স্তরগুলি সমতল আছে।

আমরা উপরে প্রস্তরের কাল নির্ণয় করিবার দুইটি উপায় দেখিলাম। কিন্তু স্তরের পর্য্যায়-বিন্যাস ও খনিজ উপকরণ দেখিয়া বহুদূরবর্ত্তী স্তরদ্বয়ের উৎপত্তি-কাল নির্ণয় করা দুষ্কর। এ সকল স্থলে স্তরে প্রোথিত জীবাবশেষ বিচার করিয়া কাল নির্ণয় করিতে হয়। মনে কর, দুইটি বিভিন্ন ও দূরবর্ত্তী স্তরে একই প্রকার শম্বুক দেখা গেল। ঐ দুইটি স্তরের উপরের ও নীচের স্তরে অন্যরূপ প্রাণী।

ইহাতে জানা যায় যে, ঐ দুইটি বিভিন্ন স্তর যে সময় উৎপন্ন হয়, তখন উক্ত প্রকার শম্বুক প্রচুর পরিমাণে ঐ স্থানে জন্মিত, এবং ঐ প্রকার শম্বুক যখন জন্মিত, তখন ঐ দুইটি স্তর উৎপন্ন হইয়াছিল; অর্থাৎ ঐ দুইটি স্তর সমকালিক। খাসিয়া-পাহাড়ের উপর নানাস্থানে সমুদ্রজ শম্বুকের খোলা দৃষ্ট হয়। ইহাতে কি জানা যায়? সমুদ্রজ প্রাণী কখন উচ্চ পাহাড়ের উপর জন্মে নাই। অতএব নিশ্চয় প্রতীতি হইবে যে, অতি পূর্ব্বকালে খাসিয়া-পাহাড় সমুদ্রতল ছিল। কালক্রমে কোন উৎক্ষেপণীশক্তি দ্বারা উহা উচ্চ পাহাড়ে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে জীবাবশেষ আলোচনা করিয়া কোন্ স্থানে পূর্ব্বে সমুদ্রের অংশ, কি হ্রদ বা বিলের অংশ, কি নদী বা মোহানা ছিল, তাহা অবগত হওয়া যায়।

এই সকল উপায়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশের স্তরের উৎপত্তি কাল নির্ণয় করা যাইতে পারে। কোন স্তর আজ হইতে কত বৎসর পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা বলা অসম্ভব। তবে, আজিকাল যে হারে নূতন স্তর উৎপন্ন হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, যে, এক একটি স্তর উৎপন্ন হইতে বহু যুগ লাগিয়া থাকিবে।

স্তরীভূত প্রস্তরে প্রোথিত জীবাবশেষ বিচার করিলে, জীব-সৃষ্টি-সম্বন্ধে আমরা বিস্তর অবগত হইতে পারি। এইরূপ নানা স্থানের জীবাবশেষ বিচার করিলে জানা যায় যে, পুরাকাল হইতে পৃথিবীতে নানা জীবের আবির্ভাব ও প্রাচীন জীবের লোপ হইয়াছে। আজিকাল আমরা যে সমস্ত উদ্ভিদ্ ও প্রাণী দেখিতে পাইতেছি, তাহাদিগের অধিকাংশই পূর্ব্বে ছিল না। অবশ্য দুই চারি শত বা সহস্র বৎসরের মধ্যে এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। কিন্তু দুই চারি সহস্র বৎসর পৃথিবীর বয়ঃক্রমের সহিত তুলনায় মুহূর্ত্তবৎ প্রতীয়মান হইবে। লক্ষ

লক্ষ, কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে,পৃথিবীর আদিম অবস্থায় অতি সামান্য সামান্য জীব সৃষ্ট হইয়া ক্রমে পৃথিবীর বয়ঃক্রম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন উৎকৃষ্টতর জীবের আবির্ভাব দেখা যায়। পৃথিবী যে একবারেই এক্ষণকার অবস্থায় সৃষ্ট হয় নাই, তাহার আভাস ৪র্থ অধ্যায়ে দেওয়া গিয়াছে। আদিম অবস্থা হইতেই উহা মনুষ্যের আবাস-ভূমি ছিল না। এমন কি, উহার বয়ঃক্রমের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিলে বলা যায় যে, অতি অল্প দিন হইল পৃথিবীতে প্রথম মনুষ্য দেখা গিয়াছে। কেবল ইহাই নহে,মনুষ্যকে আজি কাল যেরূপ সুসভ্য দেখা যায়, তখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তখন লৌহ লইয়া অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে জানিত না! কঠিন শিলার খন্তা, ছুরী, বাইস প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া নিতান্ত অসভ্য ভাবে জীবন যাপন করিত। গঙ্গার সমভূমিতে ও অন্যান্য স্থানে আদিম মনুষ্যের ব্যবহৃত শিলাময় অস্ত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। সিংহভূম জেলায় কঠিন শিলাময় কয়েকটি 'বাইস' পাওয়া গিয়াছে। তাহার একটির প্রতিরূপ এস্থলে প্রকাশিত হইল। ব্রহ্মদেশে এরূপ 'বাইস' যথেষ্ট

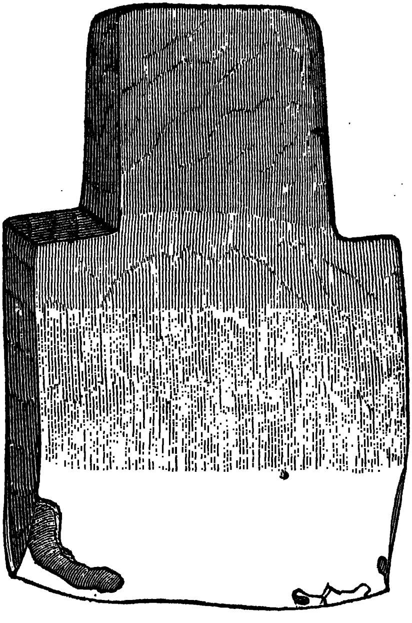

২৪ চিত্র। কঠিন শিলাময় 'বাইস'।

পাওয়া যায়। অনেকের বিশ্বাস আছে যে, বজ্রপাত হইলে এইরূপ শিলাময় সামগ্রী ভূমধ্যে প্রোথিত হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, এরূপ সংস্কার ভ্রমাত্মক। যাহা হউক পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস এস্থলে শিক্ষা করা উদ্দেশ্য নহে। উহাও একটি প্রকাণ্ড বিজ্ঞান-শাস্ত্র। সুতরাং এই সমস্ত আশ্চর্য্যজনক পৃথিবীর ইতিবৃত্ত পাঠে আমরা এক্ষণে বিরত থাকিলাম।

১০১। জীবজ প্রস্তর। জীব কাহাকে বলে, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তরুলতাদি উদ্ভিদ্ ও পশুপতঙ্গাদি প্রাণী লইয়া জীব। উদ্ভিদ্‌কে হয়ত অনেকে জীব বলিতে সম্মত হইবেন না। কিন্তু প্রাণীগণের ন্যায় উহাদিগেরও জন্ম, পরিবর্দ্ধন, মৃত্যু ও সন্তানস্বরূপ বীজ উৎপাদন ক্রিয়া আছে। জীবাদির নষ্টাবশেষ দ্বারা কিরূপে নূতন নূতন ভূভাগ উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয় এখানে দেখা যাইতেছে।

১০২। পাথুরিয়া কয়লা। পাথুরিয়া কয়লা বোধ হয় সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। উহা কি পদার্থ, কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে? কোন্ বস্তুটি কোন্ কোন্ পদার্থে গঠিত, তাহা রসায়ন-বিজ্ঞানের সাহায্যে জানিতে পারা যায়। একখণ্ড কাষ্ঠ ও একখণ্ড পাথুরিয়া কয়লার মৌলিক উপাদান নির্ণয় করিলে দেখা যায় যে, উভয়ই একই উপাদানে নির্ম্মিত; শুদ্ধ ইহাই নহে, কয়েকটি উপাদানের ভাগের সামান্য প্রভেদ ব্যতীত উভয়ের মধ্যে অন্য কোন পার্থক্য নাই।

পাথুরিয়া কয়লা যে পরিবর্ত্তিত উদ্ভিজ্জাবশেষ, তাহা অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়। ঐ যন্ত্র দ্বারা পাথুরিয়া কয়লা পরীক্ষা করিলে, অধিকাংশ স্থলে কাষ্ঠের আঁইশ প্রভৃতি উদ্ভিদের চিহ্ন সকল স্পষ্ট দেখা যায়। আবার অনেক স্থলে যে সকল উদ্ভিদ পরিবর্ত্তিত হওয়াতে পাথুরিয়া কয়লা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদিগের

পাতা, ডাঁটা, ফল প্রভৃতি অংশসমুদয় দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ, পরিবর্ত্তিত উদ্ভিদই পাথুরিয়া কয়লা।

সকলেই দেখিয়া থাকিবেন যে, শৈবাল, ঝাঁজি, শুষনি শাক প্রভৃতি কতকগুলি উদ্ভিদের ফুল হয় না। বঙ্গদেশে পুরাতন কূপের ও ভিজা ভগ্ন প্রাচীরের গাত্রে এবং অপর ভিজা ও ছায়াবৃত স্থানে এক জাতীয় উদ্ভিদ জন্মে। উহাদিগের সাধারণ ইংরাজী নাম ফার্ণ বা পালকপাতার গাছ। পাখীর পালকের যেমন মধ্যে একটি মোটা ডাঁটার দুই পার্শ্বে কাটা কাটা থাকে, তদ্রূপ পালকপাতার গাছের পাতা কাটা কাটা। শৈবাল, ঝাঁজি, পালকপাতা, বেঙের ছাতি প্রভৃতি উদ্ভিদের ফুল হয় না, এজন্য উহাদিগকে অপুষ্পক বলে। ইহাদিগের গঠন নির্ম্মাণ বিচার করিলে, ইহাদিগকে নিকৃষ্ট জাতীয় উদ্ভিদ্ বলা যায়। ইহাদিগের নিকট চাঁপা, গোলাপ, বকুল প্রভৃতি পুষ্পক উদ্ভিদ্ উৎকৃষ্ট জাতীয়।

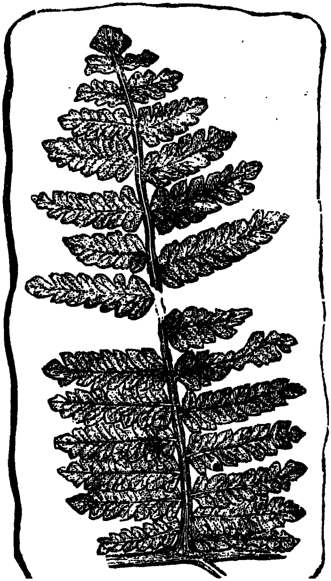

২৫ চিত্র। প্রোথিত পালক পাতার ছাপ।

নিকৃষ্ট জাতীয় অপুষ্পক উদ্ভিদ্ বিনষ্ট ও পরিবর্ত্তিত হইয়া পাথুরিয়া কয়লা উৎপন্ন হইয়াছে। রাণীগঞ্জে ও ভারতের নানা স্থানে পাথুরিয়া কয়লার খনি আছে। পাথুরিয়া কয়লার মধ্যে মধ্যে নানা প্রকার পালকপাতা প্রভৃতি অপু-

ষ্পক জাতীয় উদ্ভিদের পাতা, শাখা, মূল পাওয়া যায়। উপরের চিত্রিত পাতা দেখিয়া উহা বুঝা যাইবে। ঐ পাতাটির ছাপ রাণীগঞ্জ কয়লার মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। রাণীগঞ্জের কোন কোন স্থানে ২০ ফুট বা ১৩।১৪ হাত পুরু পাথুরিয়া কয়লার স্তর দেখা যায়। বরাকর নামক স্থানের কয়লাখনির কোন কোন স্থানে ৩০।৩৫ ফুট পুরু কয়লা-স্তর পাওয়া গিয়াছে। প্রত্যেক কয়লা-স্তরের ঠিক নিম্নে এক কর্দ্দমস্তর দেখা যায়। এই কর্দ্দমস্তরে বৃক্ষাদির শিকড় প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। কয়লাস্তরের উপরে ও নিম্নে বালুকা, কর্দ্দম প্রভৃতি বহুবিধ স্তর থাকে।

পাথুরিয়া কয়লাস্তরের ঠিক নিম্নস্তরে বৃক্ষাদির শিকড় থাকিতে দেখিয়া বোধ হয় যে, ঐ কর্দ্দমস্তর পুরাকালে ভূ-পৃষ্ঠের মৃত্তিকা ছিল। ঐ মৃত্তিকাতে বোধ হয় পালক-পাতা, শৈবাল প্রভৃতি অপুষ্পক উদ্ভিদ্‌সমূহের অরণ্য ছিল। বৎসর বৎসর ঐ সমস্ত উদ্ভিদ্ জন্মিয়া ও মরিয়া তথায় পুরু উদ্ভিজ্জস্তর প্রস্তুত হইয়াছিল। পরে কালক্রমে তথাকার ভূমি অধোগত হওয়ায় নদীবাহিত পলিরাশি তদুপরি সঞ্চিত হইয়াছে। অতীব পুরু পলিরাশির ভারবশতঃ ও অন্যান্য কারণে ঐ সমস্ত উদ্ভিজ্জ পাথুরিয়া কয়লাতে পরিণত হইয়া থাকিবে। ২০।৩০ ফুট পুরু এক একটি কয়লাস্তর দেখিয়া সহজেই জানা যায় যে, বহু যুগের অরণ্য অবশেষে পাথুরিয়া কয়লায় পরিণত হইয়াছে।

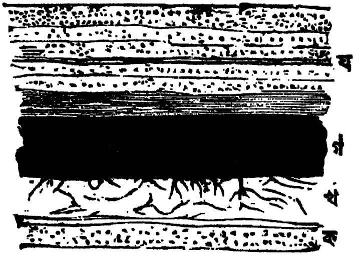

২৬ চিত্র। ক বালুকাস্তর, খ কর্দ্দমস্তর, গ পাথুরিয়া কয়লা।

১০৩। **প্রাণিজ প্রস্তর।** পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বৃষ্টিজল ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হইয়া নানাবিধ সামগ্রী দ্রব করিয়া নদীদ্বারা সমুদ্রে

আনীত হয়। বায়ুস্থিত অঙ্গারকাম্ল-গ্যাস বৃষ্টিজলের সহিত মিশ্রিত হইয়া চূর্ণময় মৃত্তিকা অতি সহজে দ্রবীভূত করে। একারণ সমুদ্রজলে চূর্ণময় মৃত্তিকা প্রচুর পরিমাণে আনীত হইতেছে।

কিন্তু এত অধিক পরিমাণে এই চূর্ণময় মৃত্তিকা সমুদ্রে আনীত হইলেও, সমুদ্রজলে ঐ সামগ্রীর পরিমাণ বেশী দেখা যায় না। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার বলিতে হইবে। কিন্তু ইহার মীমাংসাও তথায় পাওয়া যায়। সমুদ্রে অসংখ্য প্রকার ঝিনুক, শম্বুক প্রভৃতি খোলাবিশিষ্ট ছোট বড় প্রাণী বাস করিতেছে। ইহারা আপনাদিগের খোলা, হাড় প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত সমুদ্রজল হইতে চূর্ণময় সামগ্রী গ্রহণ করিতেছে। কিন্তু মৃত্যুর পর, তাহাদিগের খোলা, কঙ্কাল সমুদ্রতলে সঞ্চিত হইয়া সমুদ্রে চূর্ণময় স্তর উৎপত্তি করে।

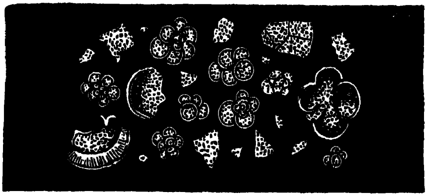

২৭ চিত্র। সমুদ্রতলের কর্দ্দম।

যে সকল প্রাণীর কঙ্কালে ও খোলায় সামুদ্রিক চূর্ণময় স্তরের উৎপত্তি হয়, তাহারা নিতান্ত ক্ষুদ্র এবং তাহাদিগের গঠন নিতান্ত সামান্য। কিন্তু আকারে অতীব সূক্ষ্ম হইলেও সংখ্যায় প্রচুর হওয়াতে পুরু পুরু স্তর উৎপাদন সম্ভবপর হয়। কোন কোন সমুদ্র ঐ প্রকার কীটাণুতে পরিপূর্ণ বলা যাইতে পারে। ঐ সকল সাগরের তলে উহাদিগের কঙ্কাল সঞ্চিত হইতেছে। আতলান্তিক সমুদ্রের তলে এক প্রকার শাদা কর্দ্দম দেখা যায়। ঐ কর্দ্দম অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দেখিলে, উহা

অসংখ্য অসংখ্য কীটাণুর খোলার সহিত অল্প মৃত্তিকাতে প্রস্তুত বলিয়া জানা যায় (২৭ চিত্র)। চা-খড়ি চূর্ণময়। উহাকে সূক্ষ্মরূপে কর্ত্তন করিয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দেখিলে, উহাতেও উক্তবিধ ক্ষুদ্র কীটাণুর কঙ্কাল দেখা যায় (২৮ চিত্র)। সমুদ্রতলের মৃত্তিকার সহিত চা-খড়ির এতদূর সাদৃশ্য যে, সমুদ্রতলের ঐ সমুদয় কীটাণু একত্রিত হইয়া চা-খড়ি উৎপাদন করিয়াছে, বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ চা-খড়ি প্রথমে ঐ রূপে সমুদ্রজ কীটাণুদ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, তদ্বিষয় অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ২৭ ও ২৮ চিত্র মিলাইলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

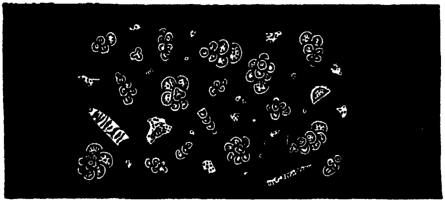

২৮ চিত্র। চা-খড়ির সূক্ষ্ম ছেদ।

বৃষ্টি ও নদী দ্বারা অবিরত কত প্রকাণ্ড বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। অল্পে অল্পে যুগ যুগান্তর ব্যাপিয়া সামান্য সামান্য কারণে কত অচিন্তনীয় ব্যাপার সংসাধিত হইতেছে, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। যদি বৎসরে সমুদ্রতলে ঐ সমুদায় কীটাণুর কঙ্কাল দ্বারা এক ইঞ্চের দশ ভাগের একভাগ মাত্র পুরু স্তরোৎপত্তি কল্পনা করা যায়, আর যদি প্রশান্ত ও আতলান্তিক সমুদ্র এক লক্ষ বৎসর মাত্রও আছে স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ঐ সময়ের মধ্যে ঐ ক্ষুদ্র কীটাণু দ্বারা উহাদিগের তলদেশে অন্যূন আট শত ফুট পুরু এক চূর্ণময় স্তর উৎপন্ন হওয়া সম্ভব।

ভারতে চা-খড়ির স্তর দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া চা-খড়িদ্বারা

ভূমি গঠন অসম্ভব মনে হইতে পারে। কিন্তু ইংলণ্ডের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভূ-ভাগ ও পাহাড় শুদ্ধ চা-খড়ি দ্বারা গঠিত। লণ্ডন নগরের নীচে স্থানে স্থানে ৬০০।৭০০ শত ফুট পুরু চা-খড়িস্তর দৃষ্ট হয়। ইংলণ্ডের পূর্ব্বদক্ষিণ উপকূলে দীর্ঘ দীর্ঘ শাদা চা-খড়ির পাহাড় অদ্যাপি শোভা পাইতেছে। ঐ সমস্ত চা-খড়ি যে বহু পূর্ব্বে সমুদ্রের তলের কর্দ্দম ছিল, তাহা এক্ষণে প্রতীতি হইবে। ভূমির অধোগমন ও উদ্‌গমন ঘটিয়া সমুদ্রতল এক্ষণে বহু জনাকীর্ণ সমৃদ্ধিশালী নগর ও উপনগরে পরিণত হইয়াছে।

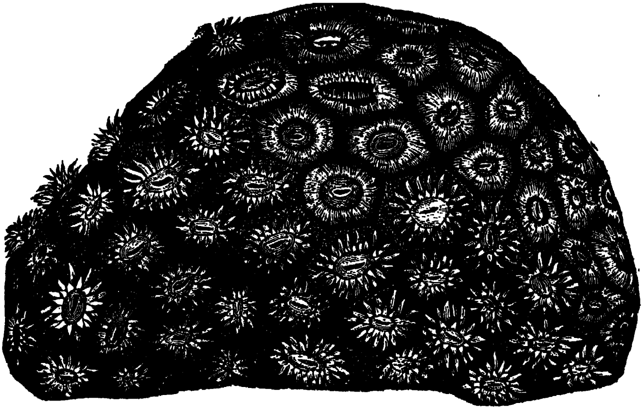

২৯ চিত্র। জীবিত প্রবালকীটের প্রতিরূপ।

উপরি বর্ণিত কীটাণু ভিন্ন, সমুদ্রে প্রবালকীট নামক অপর একটি কীট ভূ-ভাগের বিস্তর বৃদ্ধি ঘটাইতেছে। প্রবালকীট-সম্বন্ধে দুই চারি কথা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। ইহারা প্রাণী হইলেও চূর্ণময় ডাঁটা দ্বারা উদ্ভিদের[১] ন্যায় একস্থানে সংলগ্ন থাকে। কতকগুলি প্রবালকীটের

---

[১] এস্থলে পাঠককে বলা উচিত যে, অনেক নিকৃষ্ট জাতীয় প্রাণী আছে, যাহারা একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে না এবং অনেক উদ্ভিদ্ আছে, যাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

মৃত্যু হইলে, ইহাদিগের উপর আবার নূতন প্রবালকীট জন্মে। ইহাদিগের মৃত্যুর পর অন্যান্য জন্মিয়া ও মরিয়া ক্রমশঃ ইহাদিগের কঙ্কালে ভূ-ভাগ উৎপাদন করে। জীবিত প্রবালকীট সমূহের প্রতিরূপ উপরের চিত্রে প্রদর্শিত হইল।

প্রশান্ত ও ভারত সমুদ্রের বহুসংখ্যক দ্বীপ ও সমুদ্র উপকূলের নিকট চর ঐ রূপে প্রবালকীট দ্বারা গঠিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, ভারতসমুদ্রে লাক্ষাদ্বীপ, মালদ্বীপ ও চেগোদ্বীপপুঞ্জ প্রবালকীটের কঙ্কালে নির্ম্মিত। লাক্ষা ও মালদ্বীপপুঞ্জ উত্তরদক্ষিণে প্রায় আট শত মাইল স্থানে বিস্তৃত রহিয়াছে। মালদ্বীপের সুলতান আপনাকে দ্বাদশ সহস্র দ্বীপের অধিপতি বলে।

প্রবালকীটেরা জলের উপরে জন্মে না; কিন্তু অনেক স্থলে ইহারা সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশের এত নিকটে থাকে যে, ঢেউ দ্বারা স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এইরূপে প্রবালকীটজ প্রস্তর বিচ্ছিন্ন হইয়া নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে সঞ্চিত হয়। কোথাও বা প্রবালকীটজ ভূমি এই রূপে এক স্থানে ভগ্ন ও অন্য স্থানে স্তূপীকৃত হইয়া সমুদ্রজলসীমার অনেক উপরে অবস্থিত হইতেছে। ক্রমে ক্রমে তথায় বৃক্ষাদি উদ্ভিদ্ জন্মিয়া মনুষ্যাদি প্রাণিবর্গের বাসযোগ্য হয় (২৮ চিত্র)। এই রূপেই প্রবালদ্বীপের উৎপত্তি।

আবার অনেক স্থলে দ্বীপের কিম্বা অপর ভূভাগের উপকূলের কতিপয় মাইল দূরে প্রবালকীট জন্মিয়া তথায় চরের ও বাঁধের উৎপত্তি করে। অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব্বোত্তর ভূ-ভাগ হইতে ২০।৩০ মাইল সমুদ্রের

কীটাণুর ন্যায় গতিবিশিষ্ট। বস্তুতঃ উৎকৃষ্ট জাতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে বিস্তর প্রভেদ থাকিলেও, উহাদিগের নিকৃষ্ট জাতীয়ের মধ্যে এত সামান্য প্রভেদ যে, অনেক জীব, উদ্ভিদ কি প্রাণী তাহা স্থির করা দুরূহ হয়।

ভিতরে প্রায় ১২০০ মাইল লম্বা এক বাঁধ প্রস্তুত হইয়াছে। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্রায় চতুর্দ্দিকেই এইরূপ চর উৎপন্ন হইয়াছে। নিকোবর-দ্বীপপুঞ্জের প্রত্যেক দ্বীপের স্থানে স্থানে এইরূপে চড়া উৎপন্ন হইয়া এক্ষণে সমুদ্রজল হইতে ৩০।৪০ ফুট উদ্গত হইয়া নারিকেল প্রভৃতির বন হইয়াছে।

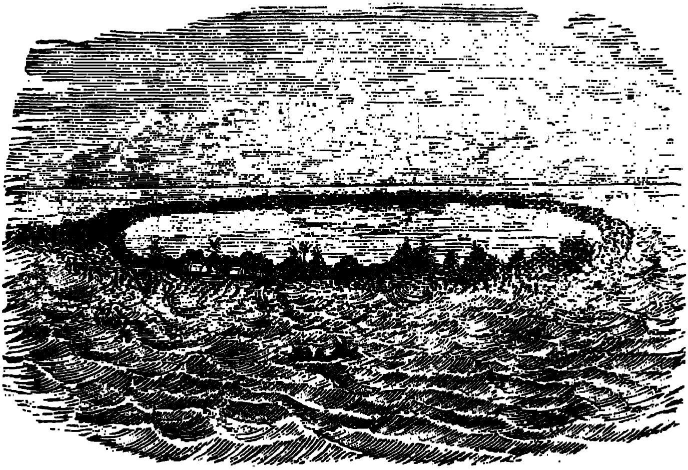

৩০ চিত্র। প্রশান্ত-সাগরস্থিত হুইট্সানডে নামক প্রবালদ্বীপ।

১০৪। অগ্নিজ প্রস্তর। আমরা উপরে স্তরীভূত ও জীবজ প্রস্তরের বিষয় আলোচনা করিলাম। স্তরীভূত প্রস্তর জলে স্তরে স্তরে উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে জীবাবশেষ থাকে। জীবজ প্রস্তরে স্তর দৃষ্ট হয় না। যে জীবসমূহ হইতে জন্মিয়া থাকে, তাহাতে তাহাদিগের নষ্টাবশেষ পাওয়া যায়। এই দুই শ্রেণীর প্রস্তর ব্যতীত আমরা আরও অনেক প্রকার প্রস্তর দেখিতে পাই। আগ্নেয়গিরি হইতে যে নিঃস্রব বহির্গত হয়, তাহা স্তরীভূত কিম্বা জীবজ নহে। তদ্রূপ, বালেশ্বরের

ও গয়ার পাথর, জয়পুরের মর্ম্মর প্রস্তর,চকমকির পাথর প্রভৃতিতে স্তর দেখা যায় না, কিম্বা তাহারা কোন জীব দ্বারাও উৎপাদিত নহে। এই সমুদায় প্রস্তরকে অগ্নিজ বলে। যেহেতু ভূ-গর্ভস্থিত নিরতিশয় তাপ দ্বারা তাহারা পরিবর্ত্তিত হইয়া এরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। আগ্নেয়গিরি ও অন্যান্য অধিকাংশ পর্ব্বতাদি ঐ অগ্নিজ প্রস্তর দ্বারা গঠিত। এই প্রস্তরে জীবাবশেষ দৃষ্ট হয় না, তবে কোন কোন স্থলে স্তরচিহ্ন দেখা যায়।

১০৫। **সংক্ষিপ্তসার।** এই অধ্যায়ে আমরা ভূ-পঞ্জরের বিষয় আলোচনা করিলাম। ভূ-পঞ্জরের উপরিদেশে মৃত্তিকা ; ঐ মৃত্তিকার উপর বৃক্ষাদি উদ্ভিজ্জ জন্মিয়া থাকে। মৃত্তিকা নানা স্থানে নানা উপকরণে গঠিত। কোথাও বা বালুকাময়, কোথাও বা চূর্ণময়, এবং কোথাও বা জীবাবশেষময় এবং কোথাও বা আটালমৃত্তিকাময়। মৃত্তিকার নিম্নে আমরা স্তরীভূত, জীবজ ও অগ্নিজ, এই তিন শ্রেণীর প্রস্তর দেখিতে পাই। স্তরীভূত প্রস্তর জলদ্বারা জলে উৎপন্ন হয়। এই প্রস্তরেই জীবাবশেষ পাওয়া যায়। এইজন্য এই প্রস্তর আলোচনা করিয়া পৃথিবীর আদিম অবস্থা হইতে আজি পর্য্যন্ত যত প্রকার উদ্ভিদ্ ও প্রাণী জন্মিয়াছে, তৎসমুদায় জানিতে পারি। শুদ্ধ ইহাই নহে, পুরাকাল হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের জল বায়ুর এবং জলস্থলের কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা জীবাবশেষ আলোচনাদ্বারা জানিতে পারা যায়। পরে জীবজ প্রস্তরের মধ্যে অগ্রে পাথুরিয়াকয়লা-রূপ উদ্ভিজ্জ প্রস্তরের উৎপত্তি ও প্রকৃতি আলোচনা করিয়া, সমুদ্রজ কীটাণু ও প্রবালকীটদ্বারা চা-খড়ি ও প্রবালদ্বীপাদির উৎপত্তির বিচার করা গিয়াছে। অবশেষে আগ্নেয়গিরি হইতে উৎক্ষিপ্ত এবং অন্যান্য প্রস্তর, যাহারা অগ্নি ও চাপে পরিবর্ত্তিত হইয়া নানাস্থানে পর্ব্বতাদিরূপে বিরাজ করিতেছে, সেই সকল অগ্নিজ প্রস্তর উল্লেখ করা গিয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পৃথিবীর আকৃতি ও গতি।

১ § পৃথিবীর আকৃতি ও পরিমাণ।

১০৬। পৃথিবী গোলাকার। অনেকের সংস্কার আছে যে, এই পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ একটি বিস্তৃত সমতল। বাস্তবিক, এ বিশ্বাস ভ্রমাত্মক। পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় যে, পৃথিবী একটি প্রকাণ্ড গোলাকার বস্তু। ইহার গোলত্বের অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। এস্থলে দুই একটি মাত্র বর্ণিত হইল।

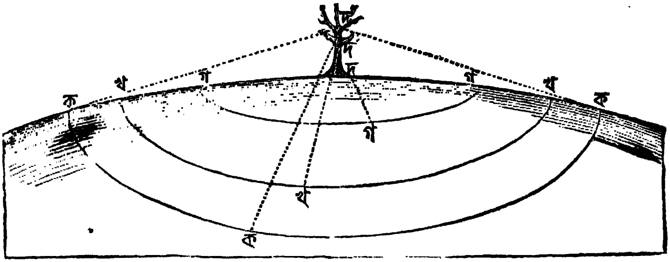

৩১ চিত্র। দ স্থান হইতে দেখিলে গ গ গ, দ′ স্থান হইতে দেখিলে খ খ খ এবং দ″ স্থান হইতে দেখিলে ক ক ক, চক্রবাল হইবে।

(১) বৃক্ষাদিশূন্য কোন বিস্তৃত প্রান্তরে দণ্ডায়মান হইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলে, চারিদিকের সমান দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তখন দৃষ্টি-সীমা একটি বৃহৎ বৃত্তে আবদ্ধ হইবে। ঐ বৃত্তাকার সীমাকে চক্রবাল বলে। তখন বোধ হইবে যেন পৃথিবী ও আকাশ ঐ বৃত্তস্থলে মিলিত হইয়াছে। ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলে,

চারিদিকে প্রায় ১৬ ক্রোশ মাত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু কোন বৃক্ষের শাখা হইতে দেখিলে, বেশী দূর পর্য্যন্ত, আরও উচ্চে উঠিলে আরও বেশী দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইবে। এইরূপ যতই উচ্চে আরোহণ করা যায়, ততই অধিক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায় (৩১ চিত্র)। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ গোল না হইয়া সমতল হইলে, এরূপ কখন ঘটিত না। সমতল ক্ষেত্র যত বড় হউক না কেন, উহার এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া দৃষ্টিপাত করিলে ক্ষেত্রের অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান দেখা যাইত। দূরত্ববশতঃ দ্রব্যাদি কেবল ক্ষুদ্র দেখাইত মাত্র।

৩২ চিত্র। তটাভিমুখে জাহাজ আসিলে কিম্বা তট হইতে জাহাজ যাইলে, উহা এইরূপে ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়।

(২) এই প্রমাণটি সমুদ্রকূলবাসী সহজে পরীক্ষা করিতে পারেন। সমুদ্রতীর হইতে জাহাজ ছাড়িবার সময় দেখা যায় যে, দূরত্ববৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইতে থাকে। এতদ্ভিন্ন, তাহার তলদেশ ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া অবশেষে তাহার মাস্তুল ও পাইল মাত্র দেখা যায়। অল্পে অল্পে তাহাও অদৃশ্য হয়। পুনশ্চ, যখন কোন জাহাজ সমুদ্রতটাভিমুখে আইসে, তখন তাহার মাস্তুল ও পাইল সর্ব্বাগ্রে দেখা যায়, ক্রমে যতই অগ্রসর হইতে থাকে, ততই তাহার তলদেশ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ ঘটিবার কারণ সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশের গোলত্ব। জাহাজ কিয়দ্দূরে থাকিলে ঐ গোলত্ববশতঃ উহার তলদেশ দেখা যায় না। যতই দূরে থাকে, ততই গোলত্ব বাড়াতে জাহাজের তলদেশের অনেকখানি অংশ দর্শকের চক্রবালের নিম্নে পড়ে। সমতলক্ষেত্র হইলে

জাহাজ যত দূরে থাকুক না কেন, উহার তলদেশ হইতে মাস্তল পর্য্যন্ত সমুদয়টি দেখা যাইত। কেবল দূরত্ববশতঃ উহা অস্পষ্ট হইত মাত্র।

(৩) পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সমতল হইলে সূর্য্য উদয় হইবামাত্র উহা পৃথিবীর এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান হইতে একই সময়ে দেখা যাইত। কোন দালানের এক প্রান্তে এক দীপ জ্বালিলে, উহার অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তৎক্ষণাৎ আলোকময় হয়। কিন্তু প্রদীপ ও শেষোক্ত প্রান্ত মধ্যে কোন উচ্চ সামগ্রী থাকিলে, উক্ত প্রান্ত কখন আলোক পাইতে পারে না। এইরূপ কারণবশতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, চট্টগ্রামের লোক যখন সূর্য্যোদয় দেখে, তখন কলিকাতায় ১৩।১৪ মিনিট, মাদ্রাজে প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা এবং বোম্বাই সহরে প্রায় সওয়া এক ঘণ্টা বিলম্ব থাকে।

এই সমুদায় ও অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা জানা যায় যে, পৃথিবী গোলাকার। কিন্তু উহা সর্ব্বদিকে সমান গোল নহে। উত্তর দক্ষিণে উহা কিঞ্চিৎ চাপা। সাধারণতঃ বলা যায় যে, পৃথিবী কমলা লেবুর ন্যায় দুই পার্শ্বে চাপা। কিন্তু কমলা লেবু যতখানি চাপা, পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ ভাগ ততখানি চাপা নহে।

১০৭। পৃথিবীর পরিমাণ। পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ দুই প্রান্তকে মেরু বলে। উত্তর মেরুকে সুমেরু এবং দক্ষিণ মেরুকে কুমেরু বলা যায়। পৃথিবীর পূর্ব্ব পশ্চিমের ঠিক মধ্যস্থলের চারিদিকে এক বৃহৎ বৃত্ত কল্পনা করা হয়, তাহাকে নিরক্ষবৃত্ত বলে। দুই মেরু এক রেখা দ্বারা যোগ করিলে পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণের ব্যাস পাওয়া যায়। পরিমাণ দ্বারা জানা যায় যে, ঐ ব্যাস ৭,৮৯৯॥ মাইল এবং পৃথিবীর পূর্ব্ব পশ্চিমের বা নিরক্ষবৃত্তের ব্যাস ৭,৯২৬॥ মাইল; অর্থাৎ পূর্ব্ব-পশ্চিম অপেক্ষা পৃথিবী উত্তর দক্ষিণে ২৭ মাইল ছোট। কিন্তু ৭,৯২৬

মাইলের পক্ষে ২৭ মাইল অতি যৎসামান্য। এজন্য সাধারণতঃ পৃথিবীকে গোলাকার বলা অন্যায় নহে। কিন্তু কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, যে পৃথিবীর উপর হিমালয়ের ন্যায় অত্যুচ্চ পর্ব্বতাদি রহিয়াছে, তাহাকে কি প্রকারে গোল বলা সঙ্গত হয়। কিন্তু দেখ ঐ পর্ব্বতও উচ্চতায় ৫॥ মাইল মাত্র। ৭৯০০ মাইলের পক্ষে ৫॥ মাইল উচ্চতা,কমলা লেবুর গাত্রের উচ্চনীচের ন্যায়ও নহে। অথচ কমলা লেবুকে গোল বলা যায়।

২ § পৃথিবীর গতি ও ঐ গতির ফল।

১০৮। **পৃথিবীর আবর্ত্তন।** পৃথিবীকে আপাততঃ নিশ্চল এবং চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কসমূহকে গতিমান্ বোধ হয়। বাস্তবিক তাহা নহে। পৃথিবীর দুই প্রকার গতি আছে। ঐ দুই প্রকার গতি ক্রমান্বয়ে বর্ণিত হইতেছে।

প্রতিদিবস প্রাতঃকালে সূর্য্যকে পূর্ব্বদিকে উদয় হইতে ও সন্ধ্যাকালে পশ্চিমদিকে অস্ত যাইতে দেখি। রজনীতে পূর্ব্বদিকে নক্ষত্রাদিকে উদয় হইয়া পশ্চিমে চলিয়া যাইতে দেখা যায়। বহুবিধ প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, পৃথিবী স্বীয় মেরুদণ্ডে আবর্ত্তন করাতে উহাদিগকে গতিবিশিষ্ট দেখায়। রেলের গাড়ীতে ভ্রমণ করিবার সময় যখন গাড়ী কোন ষ্টেসন বা আড্ডায় আইসে, আর যদি ঐ ষ্টেসনে অপর একখানি গাড়ী নিশ্চল থাকে, তখন মনে হয় যেন,অপর নিশ্চল গাড়ীখানি চলিতেছে এবং নিজের গাড়ীখানি স্থির রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন, গাড়ী বেগে চলিবার সময় মনে হয় যেন,পার্শ্বস্থিত বৃক্ষাদি গাড়ীর গতির বিপরীত দিকে ধাবমান হইতেছে। ষ্টীমারে যাইবার সময়ও এইরূপ দেখায়। অথচ এরূপ জ্ঞান ঠিক নহে। তদ্রূপ, যদিও আমরা প্রতিদিন সূর্য্যকে পূর্ব্বদিকে উদয় এবং পশ্চিমে অস্ত যাইতে দেখি এবং

বোধ হয় যেন, সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, তথাপি এইরূপ জ্ঞান উক্ত উদাহরণের ন্যায় ভ্রমাত্মক। বাস্তবিক, নানাবিধ পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা পৃথিবীর গোলত্ব প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

স্বীয় মেরুদণ্ডে পৃথিবীর আবর্ত্তনবশতঃ দিবারাত্রি সংঘটিত হয়। নিম্নলিখিত পরীক্ষাটি করিলে এবিষয় স্পষ্ট বুঝা যাইবে। আটাল মৃত্তিকার গোলকের কিম্বা কমলা লেবুর কেন্দ্র দিয়া এক শলাকা প্রবেশিত কর। ঐ গোলকের কিম্বা লেবুর কোন স্থানে খড়ি দিয়া চিহ্নিত কর। মনে কর,ঐ চিহ্নিত স্থানটি তোমার গ্রাম বা নগর এবং গোলকটি পৃথিবী। একটি দীপের নিকট ঐ গোলকটি ঘুরাও (৩৩ চিত্র)। দেখ, চিহ্নিত স্থান হইতে সূর্য্যোদয়, মধ্যাহ্ন, সূর্য্যাস্ত, রাত্রি প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারের ন্যায় সমুদয় লক্ষিত হইবে। বাস্তবিক, উক্ত দীপের ন্যায় সূর্য্য নিশ্চল। নিম্নস্থ ৩৪ চিত্রদ্বারা পৃথিবীর আবর্ত্তনের দিক্ বুঝা যাইবে। মেরুদণ্ডের চারিদিকে পৃথিবীর একবার আবর্ত্তন করিতে এক অহোরাত্রি বা ২৪ ঘণ্টা লাগে। এজন্য ঐ আবর্ত্তনকে কখন কখন উহার আহ্নিক গতি বলা যায়। এই আহ্নিক গতি আছে বলিয়াই আমরা সময় পরিমাণ করিতে পারি। যদি পৃথিবী সূর্য্যের ন্যায় নিশ্চল থাকিত,তাহা হইলে আমরা কখন প্রাতঃকাল,কখন সন্ধ্যাকাল, কখন মধ্যাহ্নকাল, কখন রাত্রি কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতাম না।

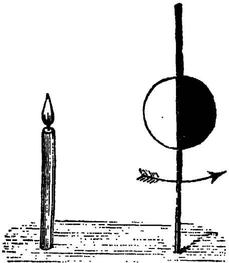

৩৩ চিত্র।

১০৭। পৃথিবীর পরিভ্রমণ। উপরি বর্ণিত আহ্নিকগতি ব্যতীত পৃথিবীর অপর একটি গতি আছে। খেলাইবার লাটিম ঘুরিতে ঘুরিতে যেমন সরিয়া যায়, তদ্রূপ পৃথিবী আবর্ত্তন করিতে করিতে

শূন্যমার্গে সূর্য্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষার গোলকটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে দীপের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করাও (৩৫ চিত্র)। ঐ গোলকের ন্যায় পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। যে শূন্যপথে পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, তাহাকে পৃথিবীর কক্ষ বলে। মেরুদণ্ডে পৃথিবীর আবর্ত্তন বোধ না হইয়া যেমন পৃথিবীর চারিদিকে সূর্য্য ঘুরিতেছে বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ এস্থলেও সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবীকে ঘুরিতে দেখা না গিয়া সূর্য্যকে গতিমান দেখা যায়। এজন্য আমরা সূর্য্যকে প্রতিদিন একস্থান হইতে উদিত হইতে দেখি না। মনে কর ১০ই চৈত্র কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে দেখাতে, সূর্য্যকে কোন দূরবর্ত্তী বৃক্ষের পার্শ্ব দিয়া উদয় হইতে এবং পশ্চিমদিকের অপর কোন বৃক্ষের পার্শ্ব দিয়া অস্ত যাইতে দেখা গেল। বৈশাখ কিম্বা জ্যৈষ্ঠ মাসে উক্ত স্থান হইতে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত দেখ; পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষদ্বয়ের কিঞ্চিৎ উত্তরে সূর্য্যকে উদিত ও অস্তগত হইতে দেখিবে। এইরূপে উহাকে ১০ই আষাঢ় পর্য্যন্ত ক্রমশঃ উত্তরদিকে

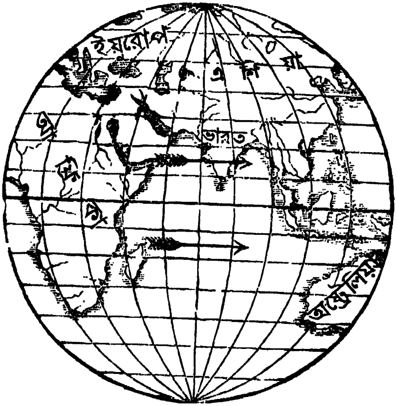

৩৪ চিত্র। পৃথিবীর আবর্ত্তনের দিক্ শরচিহ্ন দ্বারা দেখান হইয়াছে।

অগ্রসর হইয়া উদয় ও অস্ত হইতে দেখা যাইবে। ১০ই আষাঢ়ের পর উহা আবার অল্পে অল্পে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া ১০ই আশ্বিন পুনর্ব্বার ঠিক পূর্ব্বদিকে উদয় ও পশ্চিমদিকে অস্ত হইতে দেখিবে। পরে অল্পে অল্পে পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষদ্বয়ের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে যাইতে দেখা যাইবে। এইরূপে ১০ই পৌষ দক্ষিণদিকে অগ্রসর হওয়া শেষ করিয়া সূর্য্য পুনর্ব্বার তথা হইতে পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষদ্বয়ের নিকটাভিমুখে আসিতে থাকিবে। ঠিক পূর্ব্বদিক্ হইতে সূর্য্যের উত্তরদিকে আগমনকে উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণদিকে আগমনকে দক্ষিণায়ন বলে।

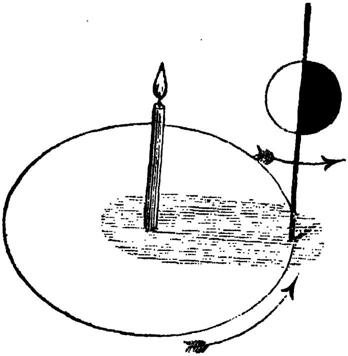

৩৫ চিত্র।

উপরি বর্ণিত বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারিলাম যে, ১০ই চৈত্র ও ১০ই আশ্বিন, এই দুই দিবস সূর্য্য ঠিক পূর্ব্বদিকে উদিত ও পশ্চিমদিকে অস্তগত হয়। অর্থাৎ সূর্য্য ঐ দুই দিবস পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের উপর অবস্থিত থাকে। এজন্য ঐ ঐ দিবস পৃথিবীর সর্ব্বত্র দিবারাত্রির পরিমাণ সমান হয়। সূর্য্যের উত্তরায়ণে উহা ক্রমশঃ আমাদিগের মস্তকোপরি আইসে। তখন দিবাভাগ রাত্রিভাগ অপেক্ষা বড় হইতে থাকে। ১০ই আষাঢ় দিবাভাগ সর্ব্বাপেক্ষা বড়। বঙ্গদেশে ঐ সময় রাত্রি অপেক্ষা দিবা প্রায় ১৷৷০ ঘণ্টা বড় হয়। ১০ই আশ্বিন হইতে সূর্য্যের দক্ষিণায়ন হয়। ঐ দিবস হইতে পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের উত্তরাংশে দিনমান ছোট হইতে থাকে। ১০ই পৌষ দিবা সর্ব্বাপেক্ষা ছোট হয়। বঙ্গদেশে ঐ দিবস রাত্রিমান অপেক্ষা দিনমান প্রায় ১৷৷০ ঘণ্টা ছোট হয়। ১০ই পৌষ হইতে দিবাভাগ

অল্প অল্প বাড়িয়া ১০ই চৈত্র[১] দিবসে দিবা ও রাত্রি সমান হয়। কিন্তু এস্থলে বলা আবশ্যক যে, আমাদের দেশ লইয়া নিরক্ষবৃত্তের উত্তরাংশে যখন দিনমান ছোট ও বড় হয়, তখন উহার দক্ষিণাংশে দিনমান ক্রমান্বয়ে বড় ও ছোট হইয়া থাকে।

১১০। **শীত ও গ্রীষ্ম।** শীত ও গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুভেদের কারণ এক্ষণে সহজে বুঝা যাইবে। উপরে উক্ত হইল যে, আমাদের দেশে আশ্বিন হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত রাত্রি অপেক্ষা দিবা ছোট থাকে। সুতরাং পৃথিবী দিবাভাগে সূর্য্যতাপ অপেক্ষাকৃত অল্প পাইয়া থাকে। অন্যদিকে আবার, রাত্রিভাগ বড় হওয়াতে দিবসে প্রাপ্ত সূর্য্যতাপের অধিকাংশ বিকীর্ণ হইয়া নষ্ট হয়। পুনশ্চ, ঐ সময় সূর্য্যের দক্ষিণায়ন হওয়াতে, কিরণসমূহ তির্য্যক্‌ভাবে আইসে; তাহাতে তাপ-পরিমাণ বিস্তর কম পড়ে। এই দুই কারণবশতঃ যথেষ্ট সূর্য্যতাপ অভাবে নিরক্ষবৃত্তের উত্তরবর্ত্তী সমুদয় স্থানে তখন শীতকাল হয়।

চৈত্র হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত রাত্রি অপেক্ষা দিবা বড় থাকে। এজন্য তখন দিবাভাগে আমরা অনেকখানি তাপ প্রাপ্ত হই। রাত্রি তখন ছোট হওয়াতে বিকিরণবশতঃ ঐ তাপের অল্পই নষ্ট হয়। পুনশ্চ, তখন সূর্য্য আমাদের মস্তকোপরির নিকট থাকে। এজন্য উহার কিরণসমূহ প্রায় লম্বভাবে পতিত হয়; তাহাতে তাপ-পরিমাণ অনেক বেশী হয়। এই দুই কারণবশতঃ আমাদের দেশ প্রভৃতি নিরক্ষবৃত্তের উত্তরস্থ সমুদয় স্থানে তখন গ্রীষ্মকাল হয়।

---

[১] মোটামুটি বলিতে গেলে, বলা যায় যে, ১০ই চৈত্র ও ১০ই আশ্বিন দিবারাত্রি সর্ব্বত্র সমান হইয়া থাকে এবং নিরক্ষবৃত্তের উত্তরাংশে ১০ই পৌষ দিবা সর্ব্বাপেক্ষা ছোট ও ১০ই আষাঢ়ের দিবা সর্ব্বাপেক্ষা বড়। কিন্তু ঐ সকল দিবসের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। এমতে ১০ইর পরিবর্ত্তে ৯ই কিম্বা ১১ই দিবসে দিবা ছোট বড় ইত্যাদি ঘটে।

ফাল্গুন চৈত্রে ও ভাদ্র আশ্বিনে দিবারাত্রির পরিমাণ প্রায় সমান হয় এবং সূর্য্যও তখন নিতান্ত তির্য্যক্ বা ঠিক মস্তকোপরি থাকে না। এজন্য ঐ চারিমাস নিরক্ষবৃত্তের উত্তর কিম্বা দক্ষিণাংশে শীত কিম্বা গ্রীষ্ম না হইয়া ঋতু সুখকর হইয়া থাকে।

৩ § সূর্য্য ও পৃথিবীর সম্বন্ধ।

১১১। ইতিপূর্ব্বে বারংবার লিখিত হইয়াছে যে, সূর্য্যই তাপ দিয়া অধিকাংশ নৈসর্গিক ব্যাপারের কারণ হইয়াছে। তাপ ও আলোক না পাইলে কি তরু লতা প্রভৃতি উদ্ভিদ, কি মনুষ্য কীট পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণিবর্গ, সমস্ত জীবজগৎ পৃথিবীতে জন্মিয়া জগন্নিয়ন্তার অনন্ত মহিমা প্রচার করিত না। বাস্তবিক, সূর্য্যকে আমাদের জগতের প্রসবিতা ও রক্ষিতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

১১২। **সূর্য্যের আকৃতি, পরিমাণ ও দূরত্ব।** সূর্য্য গোলাকার। উহার ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় একশত সাতগুণ; অর্থাৎ বার লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার পৃথিবী একত্র যোগ করিলে,যত বড় হয়, সূর্য্য তত বড়। আমাদের পৃথিবী সূর্য্যের তুলনায় কত ক্ষুদ্র!

পৃথিবী হইতে সূর্য্য প্রায় নয়কোটি চৌদ্দলক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। এই অন্তর ধারণা করা কঠিন। যদি কেহ দিবারাত্রির মধ্যে ক্ষণমাত্র বিশ্রাম না করিয়া ক্রমাগত প্রতিঘণ্টায় দেড় ক্রোশ করিয়া সূর্য্যাভিমুখে যায়, তাহা হইলে তাহাকে সূর্য্যমণ্ডলে পহুঁছিতে প্রায় সাড়ে তিনহাজার বৎসর লাগিবে। যদি কোন রেলের গাড়ি প্রতিঘণ্টায় আটত্রিশ মাইল করিয়া যায়, তাহা হইলে সূর্য্যের নিকট উপস্থিত হইতে প্রায় তিন শত বৎসর লাগিবে। ভূ-পৃষ্ঠের উপর যেরূপ বায়ু আছে, যদি তদ্রূপ বায়ু সূর্য্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিত, তাহা হইলে

পৃথিবীতে কোন শব্দ করিলে, ঐ শব্দ সূর্য্যে পহুঁছিতে পনর বৎসর লাগিত। এমন কি, আলোক প্রতিসেকেণ্ডে প্রায় নয় লক্ষ মাইল যায়, ঐ দ্রুতগামী আলোককেই সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে আসিতে প্রায় আট মিনিট সময় লাগে। সূর্য্য হইতে এত দূরে থাকিয়াই আমরা সূর্য্যতাপ সহ্য করিতে পারি না, না জানি সূর্য্যের উত্তাপ কত ভয়ঙ্কর!

১১৩। সূর্য্যের উপাদান। সূর্য্য কি উপাদানে গঠিত, উহার কিরণজাল পরীক্ষা করিয়া সম্প্রতি তাহা কিয়ৎ পরিমাণে অবগত হওয়া গিয়াছে। কিন্তু অনেকের মনে হইতে পারে যে, সূর্য্য হইতে আমরা নয়কোটি দূরে থাকি; সুতরাং সূর্য্যের উপাদান নিরূপণ করা কখন কি সম্ভবপর হইতে পারে? বাস্তবিক, লৌহ, দস্তা, চূণ, তাম্র, জলজনক গ্যাস প্রভৃতি পৃথিবীস্থ অধিকাংশ মৌলিক পদার্থে সূর্য্য গঠিত, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এ কথা বলিলে অনেকে প্রলাপ বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু এক্ষণে সূর্য্যের আলোক সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষাদ্বারা সূর্য্যে ঐ সমুদয় উপাদানের অস্তিত্ব বিষয়ের কোনরূপ সন্দেহ নাই।

চন্দ্রের কলঙ্ক কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু সূর্য্যও নিষ্কলঙ্ক নহে। বাস্তবিক জ্যোতির্ব্বিদেরা দূরবীক্ষণ-সাহায্যে সূর্য্যের কলঙ্ক প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই সমস্ত কলঙ্কের গতি দেখিয়া পণ্ডিতেরা সূর্য্যেরও আপন মেরুদণ্ডে আবর্ত্তন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শুদ্ধ ইহাই নহে, উহাও পৃথিবী, চন্দ্র, গ্রহ উপগ্রহদ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিয়া প্রচণ্ডবেগে শূন্যমার্গে অপর একটি জ্যোতিষ্কাভিমুখে ধাবমান হইতেছে। ৩৬ চিত্রে সূর্য্যের কলঙ্কের একটি প্রতিরূপ দেখান গেল।

১১৪। পৃথিবী ও সূর্য্যের আকর্ষণ। সূর্য্য হইতে যে কেবল তাপ ও আলোক পাইয়া যাবতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী জীবিত রহি-

য়াছে, তাহা নহে। সূর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া পৃথিবী তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। ঐ আকর্ষণী-শক্তি যদি হঠাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে পৃথিবী একবারে কোথায় গিয়া পড়িবে, তাহা কল্পনাও করা দুঃসাধ্য। একখণ্ড ইষ্টক রজ্জু বাঁধিয়া রজ্জুর অপর প্রান্ত ধরিয়া ঘুরাইলে ইষ্টকখণ্ড হস্তের দ্বারা আকৃষ্ট হয় বলিয়া ঘুরিতে থাকে। হঠাৎ রজ্জুটি ছাড়িয়া দিলে ইষ্টকটি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। এইরূপ পৃথিবী ও গ্রহসকল সূর্য্যের দ্বারা আকৃষ্ট থাকিয়া উহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। কিন্তু রজ্জুদ্বারা আকর্ষণে যেমন রজ্জু দেখা যায়, চন্দ্রসূর্য্যাদির আকর্ষণে তদ্রূপ রজ্জুবৎ কোন সামগ্রী দেখা যায় না। রজ্জুবৎ কোন সামগ্রী না থাকিলে যে আকর্ষণ ঘটিতে পারে না, তাহা বলা উচিত নহে। প্রস্তরখণ্ড শূন্য হইতে ছাড়িয়া দিলে, উহা পৃথিবীদ্বারা আকৃষ্ট হওয়াতে ভূমিতলে পতিত হয়। পৃথিবীস্থ যাবতীয় সামগ্রী পৃথিবীদ্বারা আকৃষ্ট থাকিয়া পৃথিবীর সহিত প্রবলবেগে ঘুরিতেছে। কিন্তু এসকল স্থলে রজ্জুবৎ কোন সামগ্রী দেখা যায়

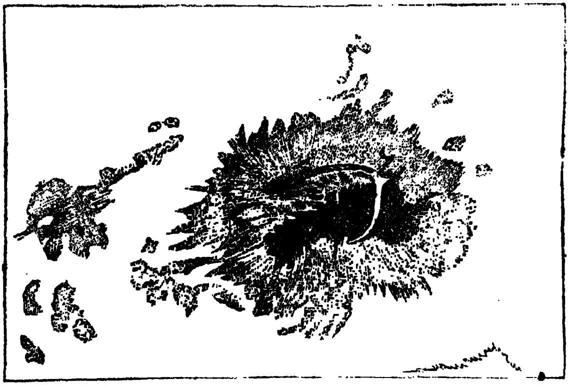

৩৬ চিত্র। সূর্য্যের কলঙ্কের প্রতিরূপ। খৃঃ ১৮৬৫ সনে দেখা যায়।

না। চুম্বকে লৌহ আকর্ষণ করে, অথচ উভয়ের মধ্যে কোনও সামগ্রী দেখা যায় না।

১১৫। **সংক্ষিপ্তসার।** আমরা এই অধ্যায়ে যাবতীয় প্রাকৃতিক ব্যাপারের সংঘটনস্থল পৃথিবীর আকৃতি, পরিমাণ ও গতি এবং সূর্য্যের সহিত উহার সম্বন্ধ আলোচনা করিলাম। পৃথিবী সম্পূর্ণ গোলাকার না হইয়া উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা। ২৪ ঘণ্টা বা এক অহোরাত্রে উহা আপন মেরুদণ্ডে একবার আবর্ত্তন করিতেছে। ঐরূপ আবর্ত্তন করিতে করিতে একবৎসরে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ঐ আহ্নিকগতি বশতঃ দিবারাত্রি এবং বার্ষিকগতি বশতঃ শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুভেদ ঘটিতেছে। কিন্তু সূর্য্যদ্বারা পৃথিবী আকৃষ্ট থাকাতেই উহা আপন কক্ষে থাকিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে সক্ষম হইতেছে। বাস্তবিক যাবতীয় গ্রহ,উপগ্রহ, চন্দ্র, সূর্য্য পৃথিবী পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণকরত আপন আপন পথে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। চন্দ্র ও সূর্য্য পৃথিবীস্থ সমুদ্রজল আকর্ষণ করাতে জোয়ারভাটা উৎপন্ন হইতেছে। এতদ্বিষয় পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। সূর্য্য একটি প্রকাণ্ড গোলাকার অগ্নিময় জড়পিণ্ড। পৃথিবী হইতে কত দূরে থাকিয়া আলোক ও তাপ দিয়া ঝড়,বৃষ্টি ও জলের বাষ্পাবস্থায় পরিণতি প্রভৃতি অধিকাংশ প্রাকৃতিক ব্যাপারের কারণ হইয়াছে। আলোক ও তাপ পাইয়াই জীবজগৎ পৃথিবীতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সূর্য্যের সহিত আমাদিগের কত নিকট সম্বন্ধ! এক অগ্নিময় জড়পিণ্ডদ্বারা বিশ্বস্রষ্টা অভাবনীয় ব্যাপার সম্পাদন করিতেছেন। সূর্য্যকে পৃথিবীর চালক ও রক্ষক বলা যাইতে পারে। কিন্তু সেই সূর্য্যের যিনি চালক ও সৃষ্টিকর্ত্তা, না জানি তাঁহার কত অনন্ত শক্তি ও অনন্ত মহিমা!

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট

দিঙ্‌নিরূপণ।

পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর অবস্থান উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম ইত্যাদি দিক্ অনুসারে ব্যক্ত হয়। এজন্য অনায়াসে দিঙ্‌নিরূপণ করিবার প্রণালী সকলের জানিয়া রাখা অত্যন্ত আবশ্যক। এখানে কয়েকটি সহজ উপায় বলা যাইতেছে।

(১) দিবাভাগে সূর্য্য প্রকাশিত থাকিলে, সহজে উত্তর দক্ষিণ দিক্ ও তৎসঙ্গে দুইপ্রহর বেলা নিরূপণ করিতে পারা যায়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলিয়াছি যে, ৯।১০ চৈত্র ও আশ্বিন সূর্য্য ঠিক পূর্ব্বদিকে উদিত ও ঠিক পশ্চিম দিকে অস্তগত হয়। সুতরাং ঐ ঐ সময় সূর্য্যোদয় কি সূর্য্যাস্ত দেখিয়া পূর্ব্ব কি পশ্চিম দিক্ নির্ণীত হইতে পারে। অন্য সময় সূর্য্যের দক্ষিণায়ন এবং উত্তরায়ণ বশতঃ উহা ঠিক পূর্ব্বদিকের দক্ষিণে কিম্বা উত্তরে দেখা যায়। রৌদ্রে ছায়া দেখিয়া দিক্ নিরূপণ করা যাইতে পারে। তাহা এই প্রকারে করা যায়।

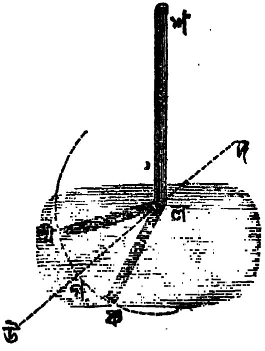

১ চিত্র।

কোন সমতল স্থানে এক কি দেড় হাত দীর্ঘ একটি শলাকা মৃত্তিকার মধ্যে ঠিক লম্বভাবে প্রোথিত কর। প্রাতঃকালে ঐ শলাকার ছায়া পশ্চিমদিকে এবং বৈকালে উহা পূর্ব্বদিকে দেখা যাইবে। কিন্তু যতই বেলা বাড়িবে, ঐ ছায়াটি ততই ছোট হইতে থাকিবে। অবশেষে ঠিক মধ্যাহ্নের সময় উহা ক্ষুদ্রতম হইবে। ঐ ক্ষুদ্রতম ছায়াটি উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। কখন উহা ক্ষুদ্রতম হইল, তাহা নিরূপণ করা কষ্টকর। এজন্য অন্য উপায়ে উহা নির্ণয় করিতে হয়। বেলা ৯।১০ টার সময় শলাকার ছায়া (ক ল)

ঐ সমতলস্থানে অঙ্কিত কর (১চিত্র)। পরে শলাকার গোড়াকে (ল) কেন্দ্র এবং ঐ ছায়াটিকে (ক ল) ব্যাসার্দ্ধ ধরিয়া শলাকার চারিদিকে এক বৃত্ত (ক গ খ) অঙ্কিত কর। বেলা ২।৩ টার সময় শলাকার ছায়া ঐ বৃত্তকে স্পর্শ করিবে। যে বিন্দুতে (খ) স্পর্শ করিবে, তাহা চিহ্নিত কর। ঐ দুই চিহ্নের (ক ও খ) মধ্যবর্ত্তী বৃত্তাংশকে দুই সমভাগে বিভক্ত করিয়া, ঐ মধ্যবিন্দুর (গ) সহিত শলাকার গোড়া এক রেখাদ্বারা যোগ করিলে, উক্ত স্থানের মধ্যন্দিন রেখা (গ ল) পাওয়া যাইবে। ঐ রেখা দৃঢ়সংস্থিত কোন তক্তায়, শ্লেটে কিম্বা পিত্তলে অঙ্কিত করিয়া রাখিলে, যখন শলাকার ছায়া ঐ মধ্যন্দিন রেখায় পতিত হইবে, তখন তথায় ঠিক মধ্যাহ্ন হইয়াছে, জানা যাইবে। বস্তুতঃ ঐ শলাকাসহ অঙ্কিত রেখাটি সূর্য্যঘড়ি হইবে। অপর কয়েকটি রেখা টানিলে, উহাদ্বারা দণ্ড কিম্বা ঘণ্টা অনায়াসে নিরূপিত হইতে পারে। ঐ মধ্যন্দিন রেখা বর্দ্ধিত করিলে উহা উত্তর ও দক্ষিণ দিক্ দেখাইয়া দিবে। কিন্তু এস্থলে বলা আবশ্যক যে, সূর্য্যঘড়ির মধ্যাহ্ন সাধারণ ঘড়ির মধ্যাহ্নের সমান নহে। বৎসরের মধ্যে কেবল চারি দিবস মাত্র সূর্য্যঘড়ির ও সাধারণ ঘড়ির মধ্যাহ্ন ঠিক সমান হয়।

(২) কিন্তু রাত্রিতে সূর্য্য দেখা যায় না; সুতরাং উল্লিখিত উপায় দ্বারা দিক্ নিরূপণ করা সম্ভবপর নহে। আকাশে চন্দ্রের অবস্থান দেখিয়া কোন কোন সময় মোটামুটি দিক্ ঠিক করা যাইতে পারে। অন্ধকার রজনীতে কোন বিশেষ নক্ষত্র দেখিয়া দিক্ স্থির করা যায়। আকাশের উত্তর দিকে ধ্রুব নামক একটি তারা আছে। অপরাপর তারকার ন্যায় উহা পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্তগত হয় না। কি দিবা কি রাত্রি, কি শীত কি গ্রীষ্ম সকল সময়ই উহা প্রায় একই স্থানে থাকে, বলিয়া উহার ধ্রুব নাম হইয়াছে। পৃথিবীর দুই মেরু এক রেখা দ্বারা যোগ করিয়া উভয় দিকে বর্দ্ধিত কল্পনা করিলে ঐ রেখাটি ঐ ধ্রুবতারায় উপস্থিত হয়। বাস্তবিক ঐ তারাটি চিনিয়া রাখিতে পারিলে, অন্ধকার রজনীতে অনায়াসে উত্তরদিক্ নিরূপিত হইতে পারে।

সামান্যতঃ এই উপায়ে উহার অবস্থান নিরূপণ করিতে পারিবে। তুমি যাহাকে উত্তর বলিয়া জান, সেই দিকে ৩ হাত ও ২ হাত দীর্ঘ দুইটি শলাকা পরস্পর ২॥৹ হাত অন্তর রাখিয়া সোজা করিয়া প্রোথিত কর। ছোট শলাকার পশ্চাতে চক্ষু রাখিয়া

উভয় শলাকার ঠিক উপর দিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। এমত করিলে তোমার দৃষ্টি আকাশের যত উচ্চে পড়িবে, প্রায় ততখানি উচ্চে উত্তরদিকে উজ্জ্বল ধ্রুবতারা দেখিতে পাইবে। ঐ তারকার চারিদিকে অনেকদূর পর্য্যন্ত তত উজ্জ্বল অপর কোন তারকা নাই। আকাশের সপ্তর্ষিমণ্ডল বা 'সাতভেয়ে' নক্ষত্র অনেকে জানেন।

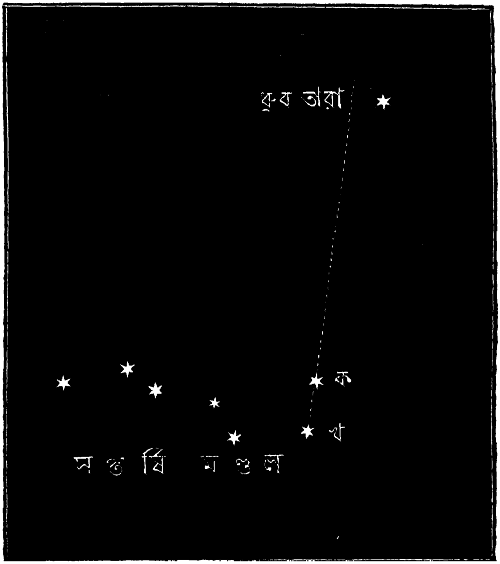

২ চিত্র।

উহারা সাতটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খড়্গের ন্যায় আকার ধারণ করিয়া আকাশের উত্তরাংশে অবস্থিত আছে। নিম্নের চিত্র হইতে উহাদিগের খড়্গাকারে অবস্থান বুঝা যাইবে। এক্ষণে ঐ সাতটির মধ্যে ক ও খ চিহ্নিত তারকা দুইটি এক রেখাদ্বারা যোগ করিয়া বর্দ্ধিত কর। কখ-র যতখানি অন্তর, তাহার ৫ গুণ বাড়াইলে, ঐ কল্পিত রেখাটি ধ্রুবতারায় পঁহুছিবে।

(৩) কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন দিবসে এবং জ্যোৎস্নাময়ী বা মেঘাবৃত রজনীতে পূর্ব্বোক্ত উপায়দ্বয় বৃথা হইবে। অকূল সমুদ্রে একদণ্ড দিক্ না জানিয়া জাহাজ চালনা বিপ-

জ্জনক। এসকল স্থলে একটি লম্বমান চুম্বক শলাকাই একমাত্র সহজ ও অভ্রান্ত দিগ্-দর্শক। একটি চুম্বক-শলাকার মধ্যে সূত্র বাঁধিয়া ঝুলাইলে কিম্বা সোলার উপর রাখিয়া জলে ভাসাইলে, উহা সর্ব্বদা প্রায় উত্তরদক্ষিণদিকে অবস্থিতি করে। কোন্ প্রান্তটি উত্তরে থাকে, তাহা একবার নিরূপণ করিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিলে,

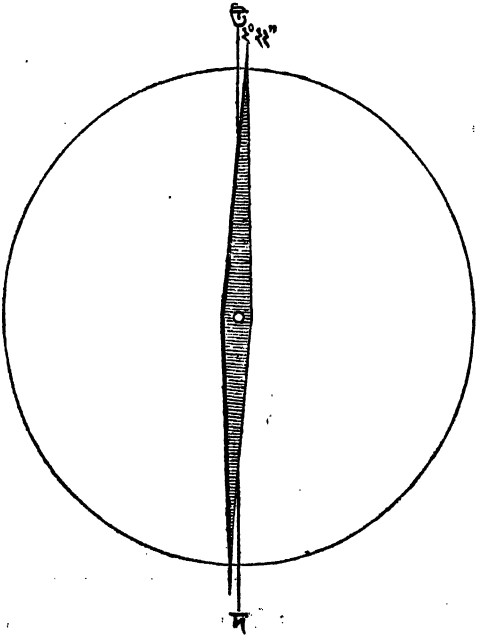

৩ চিত্র।

উহাদ্বারা উত্তরদিক্ জানা যাইবে। কিন্তু স্থানবিশেষে উহা ঠিক উত্তরে না থাকিয়া উত্তরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পশ্চিমে হেলিয়া থাকে। কলিকাতায় ও বঙ্গদেশে চুম্বকের উত্তর প্রান্ত ২° ২২′ অংশ পূর্ব্বদিক বাঁকিয়া থাকে। উপরের চিত্রদ্বারা ইহা সহজে বুঝা যাইবে। এইরূপ একটি চুম্বক-শলাকা সঙ্গে থাকিলে কি অকূল সমুদ্র, কি গহন বন, কি রাত্রি কি দিবা সর্ব্বত্রই সকল সময়ে দিক্ নির্ণয় করিয়া গমনাগমন করিতে পারা যায়।

ভ। কয়েকটি স্থানের গড় উষ্ণতার তালিকা

স্থানের নাম।	বৈশাখ জৈষ্ঠের গড় উষ্ণতা °ফা	আষাঢ় শ্রাবণের গড় উষ্ণতা °ফা	ভাদ্র আশ্বিনের গড় উষ্ণতা °ফা	কার্ত্তিক অগ্রহায়ণের গড় উষ্ণতা °ফা	পৌষ মাঘের গড় উষ্ণতা °ফা	ফাল্গুন চৈত্রের গড় উষ্ণতা °ফা	বাৎসরিক গড় উষ্ণতা °ফা
লাহোর ...	৮৭.৬	৮৯.৭	৮৩.৫	৬৫.৩	৫৫.৫	৬৯.০	৭৫.২
লক্ষ্ণৌ ...	৯০.৫	৮৭.৩	৮৩.৩	৬৯.৮	৬১.৬	৭৬.৭	৭৮.৩
হাজারিবাগ ...	৮৪.৬	৭৮.১	৭৬.৬	৬৭.২	৬২.২	৭৪.৬	৭৪.০
বহরমপুর ...	৮৫.৫	৮৩.১	৮২.১	৭৩.০	৬৫.৮	৭৭.৬	৭৭.৭
ঢাকা ...	৮২.৮	৮৩.১	৮২.৬	৭৬.৭	৬৭.৮	৭৭.৮	৭৮.২
শিবসাগর ...	৭৮.১	৮৩.৪	৮০.৯	৬৮.৭	৬০.২	৬৮.৪	৭৩.৩
দারজিলিং ...	৫৬.১	৬০.৫	৫৮.০	৪৭.৯	৪০.৩	৪৭.৫	৫১.৮
চট্টগ্রাম ...	৮১.৫	৮০.৬	৮০.৫	৭৪.০	৬৭.৯	৭৬.৫	৭৬.৯
কলিকাতা ...	৮৩.৯	৮২.৩	৮১.৪	৭৩.২	৬৮.০	৭৮.৭	৭৮.০
কটক ...	৮৭.৭	৮৩.৯	৮২.৬	৭৫.৪	৭২.১	৮২.২	৮০.৭
বোম্বাই ...	৮৩.৮	৮১.২	৮০.২	৭৮.৭	৭৪.৬	৭৮.৯	৭৯.৬
মাদ্রাজ ...	৮৬.৪	৮৫.৪	৮৩.৩	৭৮.১	৭৬.১	৮০.৮	৮১.৮

ভারতের কয়েকটি স্থানের গড় পাতের তালিক

স্থানের নাম।	বৈশাখ জ্যেষ্ঠের গড় বৃষ্টি ″	আষাঢ় শ্রাবণের গড় বৃষ্টি ″	ভাদ্র আশ্বিনের গড় বৃষ্টি ″	কার্ত্তিক অগ্রহায়ণের গড় বৃষ্টি ″	পৌষ মাঘের গড় বৃষ্টি ″	ফাল্গুন চৈত্রের গড় বৃষ্টি ″	বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ″
লাহোর …	২.১	১০.৬	৪.৯	০.৬	১.৫	১.৯	২১.৭
লক্ষ্ণৌ …	৩.৪	১৮.৫	১৩.০	১.০	১.২	০.৫	৩৭.৬
হাজারিবাগ …	৬.০	২৩.১	১৬.০	২.২	১.০	১.৩	৪৯.৬
বহরমপুর …	১০.৬	২০.৫	১৭.৮	৩.০	১.৫	২.৫	৫৫.৪
ঢাকা …	১৮.৮	২৫.৭	১৯.০	৩.৪	০.৯	৪.৭	৭৩.৬
শিবসাগর …	২৩.০	৩০.৭	২২.২	৪.২	২.৫	১০.৪	৯৩.১
দারজিলিং …	২১.৬	৫৫.৮	৩৪.৩	৩.৫	১.৫	৪.৯	১২১.৩
চট্টগ্রাম …	২৩.৪	৪৪.৪	২৭.২	৪.৭	১.৩	৪.৮	১০৫.৯
কলিকাতা ….	১১.৫	২৫.৯	১৯.৭	২.৬	১.৪	২.৫	৬৩.৭
কটক ….	৯.৩	২৩.৫	১৮.২	৪.২	০.৯	২.২	৫৮.৩
বোম্বাই ….	৯.৭	৪৬.৫	২২.৪	১.৫	০.২	০.০	৮২.৩
মাদ্রাজ ….	৩.৬	৭.০	১২.৩	২১.৭	৩.৭	০.৯	৪৯.৩

ভারতের কয়েকটি স্থানের গড় আর্দ্রতার তালিকা

স্থানের নাম।	বৈশাখ জ্যেষ্ঠের গড় আর্দ্রতা	আষাঢ় শ্রাবণের গড় আর্দ্রতা	ভাদ্র আশ্বিনের গড় আর্দ্রতা	কার্ত্তিক অগ্রহায়ণের গড় আর্দ্রতা	পৌষ মাঘের গড় আর্দ্রতা	ফাল্গুন চৈত্রের গড় আর্দ্রতা	বাৎসরিক গড় আর্দ্রতা
লাহোর …	৩৫	৫৪	৫৫	৪৯	৫৯	২৯	৫০
লক্ষ্ণৌ …	৪৪	৭১	৭১	৫৭	৫৭	৪৩	৫৭
হাজারিবাগ …	৪৫	৮০	৭৯	৫৬	৪৯	৩৬	৫৮
বহরমপুর …	৭২	৮৬	৮৫	৭৭	৭০	৫৯	৭৫
ঢাকা …	৮০	৮৭	৮৫	৭৪	৬৯	৬৮	৭৭
শিবসাগর …	৮২	৮৩	৮৫	৮৫	৮৫	৮০	৮৩
দারজিলিং …	৮৬	৯৫	৯১	৮০	৭৮	৭৫	৮৪
চট্টগ্রাম …	৮১	৮৭	৮৬	৮০	৭৩	৭৪	৮০
কলিকাতা …	৭৬	৮৮	৮৭	৭৬	৬৯	৬৭	৭৭
কটক …	৬৭	৭৪	৮০	৭০	৬৫	৬২	৭০
বোম্বাই …	৭৭	৮৬	৮৫	৭৩	৬৯	৭২	৭৭
মাদ্রাজ …	৬৭	৬৫	৭২	৭৮	৭৩	৭২	৭১